বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের সেরা গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের সেরা গল্প

দীপ প্রকাশন

১৪বি, বঙ্কিম চাট্যার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Sahityer Sera Galpa

A collection of bengali short-stories

by Bibhutibushan Bandyopadhyay

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৭

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৮

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০

পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১১

পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : মে ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৯

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬ ◆ প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যে আধুনিকতায় আমাদের মধ্যশ্রেণী অভিষিক্ত হয় তার ফলে একদিকে দেশের সঙ্গে নিবিড় চৈতন্যগত সম্পর্ক যেমন শিথিল হয়ে যায়, অন্যদিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীর্তির উত্তুঙ্গ শীর্ষ স্পর্শ করলেও ওই বিচ্ছিন্নতা উপভোগ ও উপলব্ধিতে জ্ঞানে ও অনুভবে পশ্চিমী মানদণ্ডকেই চরম ভাবে। যে রিয়ালিজমকে তারা খুঁজতে চেয়েছে, তা তারা ওই পশ্চিমেই পেয়েছে—সম্প্রতি তাতে আবার যুক্ত হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা। এই দুয়ের চাপে বাঙালি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বিবেচনা তির্যক হয়ে যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহৎ ও আমাদের বাস্তবের বহুমাত্রিক আধুনিককে আমরা বুঝতে চাইনি। তাকে কখনও মনে হয়েছে পলায়নবাদী নিছক প্রকৃতি নিমজ্জিত, মনে হয়েছে তার সময়কার উতরোল রাজনৈতিক বাস্তব থেকে, সমাজচেতনা থেকে দূরস্থিত—'রাজনীতি' ধারণাও আমাদের পশ্চিম থেকে পাওয়া। এর যে এদেশীয় রূপ, কর্ষিকা থাকতে পারে তা আমরা বুঝিনি। আসলে আমাদের উপনিবেশিক বাস্তবে পাওয়া আধুনিকতায় বিভূতিভূষণকে বোঝা কঠিন, যেমন কঠিন রবীন্দ্রনাথকে বোঝা, মনে হয় তাঁর সমাজচিন্তা আজ অবান্তর।

আসলে বিভূতিভূষণ উপনিবেশজাত আধুনিকতারই একটি কাউন্টার পয়েন্ট। সেই পশ্চিমী হাই মডার্নিজম-এর সময়েই তিনি যে সব প্রশ্ন তাঁর সাহিত্যিক নির্মাণে তুলেছিলেন, তার যাথার্থ্য আজ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। আজকের সবুজ ভাবনায়, ecologist-দের চিন্তায় বুদ্ধি বিভাসিত ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যে সমালোচনা তা বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, বারবার উচ্চারণ করেছেন। তাঁর ভাবনায় বিজ্ঞান প্রকৃতির প্রতিপক্ষ নয়, আধুনিক প্রগতির মাত্রা শেষ পর্যন্ত মানুষ। বিভূতিভূষণ বাস্তবের সঙ্গে, মানবিক প্রাকৃতিকের সঙ্গে চৈতন্যগতভাবে সংলগ্ন ছিলেন, তাই উপনিবেশিক আধুনিকতাকে, আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক সক্রিয়তার ফাঁক ও ফাঁকিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন উপনিবেশিক বাস্তবে, ধ্বস্ত জনসমাজে দাঁড়াবার জায়গা প্রকৃতি; এ প্রকৃতি ইতিহাস ও মানবস্পৃষ্ট। এদেশের সাধারণ মানুষেরই যেন প্রতিরূপ বাস্তবের দুঃসহ দারিদ্র্য, যন্ত্রণাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তাদের তিনি ওই দুঃসহ বাস্তব পেরিয়ে এক অবকাশমুখী করে দেখেছেন। কী সামাজিক, রাজনৈতিক তাৎপর্যে এটা করেন, তা দেখলে অবাক হতে হয়। প্রকৃতির মতোই এই মানুষরা বাঁচে।

বিভূতিভূষণের এই গল্পসংকলনে আমরা তাঁর গল্পের কথাই বলি। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে এক অর্থে বাস্তববাদী। মানবিক আচরণ, ভাষা, ঘরদোর—সব কিছুর ক্ষেত্রেই তিনি বাস্তবকে অনুসরণ করেন। কিন্তু ওই বাস্তবের দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অচরিতার্থতাকে অর্থাৎ বহির্বাস্তবকে তিনি চূড়ান্ত ভাবেন না, তাকে

এক অন্তর্বাস্তবে দাঁড় করান। উপনিবেশিক বাস্তবে সাধারণ মানুষের বাঁচা তো এ অনাদরে বেড়ে ওঠা প্রকৃতির লতা-গুল্মর মতো, এটাই তো এক জাদু বাস্তব— বিভূতিভূষণ এই সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্যটিকে সামনে আনেন যে দৈনন্দিন জীবনে, নিষ্পেষণ ও দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ তার প্র্যাকটিকাল অ্যাকটিভিটি বজায় রেখেছে। প্রত্যক্ষত সমাজ রাজনীতি এর অনুকূল নয়। বিভূতিভূষণ এই বাঁচার গল্প বলেন—মৃত্যুও তাঁর গল্পে জীবনের নামান্তর। প্রকৃতির মতোই জীবন মৃত্যুকে উত্তীর্ণ করে জেগে থাকে। ওই জীবনের গল্প বলেন বলেই তিনি বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যান, তিনি কালোত্তরের শিল্পী।

আর এই কারণেই শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন অকপট, তেমনি নৈর্ব্যক্তিক। এক অবৈকল্যে বিভূতিভূষণ নির্মাণ করেন আমাদের আধুনিককে—রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার এভাবেই তাঁর মধ্যে প্রবহমান। উপন্যাসে এ আধুনিক অলৌকিককে তথাকথিত জাদুবাস্তবকেও ভয় পায় না—ওই অলৌকিক তাঁর গল্পে লৌকিক, লৌকিক অলৌকিক। গল্পে, অনেক গল্পে ''আমি'' বড় চরিত্র—'আমিই' গল্প বলে। ওই আমির সূত্রেই পাই ''intersubjectivity of mind'' -এর ভিত্তি তাঁর বর্গীয় অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার পাথরকে নিজ বিষয়ীর চৈতন্যে এমনভাবে শিল্পের তাপে গলিয়ে নেয় যে গল্পগুলি তার প্রাথমিক জেসচারের হাত ছাড়িয়ে আজও ধাক্কা দেয়। বিভূতিভূষণ গল্পে দেখিয়েছেন, একটা মানুষের মধ্যে মানুষ যাকে অনেকগুলো, এক আত্মসচেতনতার নৈর্ব্যক্তিক রসায়নে তাঁর গল্প যেমন আমাদের বাস্তবের ছবি, তেমনি তা পেরিয়ে আর এক বাস্তবের। আপাত ভাবে তাঁর গল্প সহজ কিন্তু এর খাঁজে খাঁজে সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্যুৎদ্যুতি। 'রাজনীতি' এখানে জনসমাজের প্রচলিত উপচৈতন্যের আন্দোলন নয়। উপরিস্তরের অন্তরালে তিনি আবিষ্কার করেন এক অন্তঃস্তলের— গ্রামের বদ্ধ মানুষের মধ্যেই তার পরিপার্শ্বের দীনতা-কুশ্রীতা নিয়েই যে মুক্তিপিপাসা, সৌন্দর্য অভিঘাত জেগে ওঠা নতুন অভিজ্ঞান থাকে, বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে এটাই পাঠকের কাছে নিয়ে আসেন। পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করে।

বিভূতিভূষণের সোয়া দুশো ছোটগল্পের মধ্যে অনেকগুলিরই ন্যারেশন ''আমি'' করেছে। 'আমি'র দৃষ্টিকোণ—বিভূতিভূষণের অনেক গল্পেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জেনেরিক একসপিরিয়েন্স বা বর্গীয় অভিজ্ঞতাকে শিল্পের নির্মাণে আনায় এই আমিকে বিভূতিভূষণ অনেকবার ব্যবহার করেছেন। এই আমি কি লেখক? হ্যাঁ আবার না। গল্পের 'আমি'-তে লেখকের অভিজ্ঞতার ছায়া নিশ্চয়ই থাকে কিন্তু গল্পটি আমি নয়। গল্পটি ফিকশনাল জাতের। লেখক বা অথর ও তাঁর শিল্প এক নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'আমি' এক ধরনের সাবজেক্ট যার মধ্যে বিভূতিভূষণ থাকেন আবার গল্পের ক্রিয়ায় থাকেন না। গল্পের রূপবন্ধনে, ফর্মে 'আমি' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গল্পের exposition 'আমিই' ঘটায়। লেখক সর্বজ্ঞ ন্যারেটরের ভূমিকা ত্যাগ করে যখন 'আমি'কে আনেন, তখন বোঝা যায় তাঁর বর্গীয় অভিজ্ঞতাকে তিনি অন্য মোটিফে আনছেন। গল্পের চরিত্ররা আসে একটি ''fictive period of time'' -এর মধ্যে, এই সময়ের সমগ্রকে সমান গুরুত্ব দেওয়া যায় না, 'আমি'র দৃষ্টিকোণে অভিজ্ঞতায় এই সমস্যার সমাধান ঘটে। গল্পের একদিকে থাকে ঘটনার ক্রমে সাজানো অর্থাৎ ফ্যাবুলা, অন্যদিকে

পাঠক প্রত্যক্ষত ঘটনাগুলি যেভাবে দেখছে তাই অর্থাৎ সুজেট। 'আমি' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, 'আমি' ন্যারেটর হলে এই দুটিই জড়িয়ে যায়। 'আমি' শুধু ন্যারেটর নয়, অনেক সময় শ্রোতাও।

আমরা এই সংকলনের কয়েকটি গল্প ধরে আমাদের বিভূতিভূষণের গল্প সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি একটু বোঝার চেষ্টা করি। প্রথমেই দেখি, ওই 'আমি'র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও বলা একটি গল্প : 'ভণ্ডুলমামার বাড়ী'। আপাত সরল গল্পের অন্তরালে কী রকম জটিল স্থাপত্য বিভূতিভূষণের গল্পে থাকে, তার একটি প্রমাণ এই গল্পটি। গল্পটিতে বিভূতিভূষণ সময়ের যে ব্যবহার করেন তাকে বলা যায় doubleness of time. আমি গল্পের কথক আবার শ্রোতা। গল্পটিতে সময় বর্তমান থেকে অতীতে যায়। আবার পাঠক গল্পটি শুনছেন 'আমি'র জবানিতে অন্যের মুখে অর্থাৎ সময় এখানে দু-স্তরের। লেখকের সময়বিন্দু হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর সময়বিন্দুর সঙ্গে এক নয়। বিভূতিভূষণ প্রাথমিকভাবে একটি প্রচলিত গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কথক-শ্রোতার একাত্মতা এ গল্পে আনতে চান। এই পদ্ধতি গল্পটি এমন মাত্রায় পৌঁছায় যে, ভণ্ডুলমামা আর শুধু ভণ্ডুলমামা থাকে না—কোথায় যেন পাঠকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। গল্পের প্রায় শুরুতে অবিনাশবাবু জীবনের অচরিতার্থতার বোধটির কথা লেখককে জানিয়ে দেন। ভণ্ডুলমামার বাড়ি যে শেষে প্রতীকের মর্যাদা পেয়ে যায় এই ভূমিকাটুকু ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এই গল্পের সময়কাল দীর্ঘ। ছোটগল্পে এই সময়ের নিয়ন্ত্রণ বড় কথা। উপন্যাসের স্বল্প সময়ও দীর্ঘছন্দে প্রসারিত আর শিল্পরূপ হিসাবে ছোটগল্পের দাবি বিপরীত। বিভূতিভূষণ তাঁর শিল্পান্বেষায় এটা করেন। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইতিহাস ও ভণ্ডুলমামার ইতিহাস একই—এর মধ্যে একদা জাজ্জ্বল্যমান ত্রাসের করুণ পরিণতি আভাসিত ভণ্ডুলমামার স্ত্রীপুত্রের কথায় এটি স্পষ্ট। ''ভণ্ডুলমামার বাড়ী'' এক অর্থে গ্রামের উৎসন্নে যাওয়ার গল্প আবার আর এক অর্থে অবিনাশবাবুর গল্প। অবিনাশবাবুর ছেলেবেলাকার মনের পরিবর্তন, কলেজজীবন, সুরেন বাঁড়ুয্যে-বিপিন পালের বক্তৃতায়, স্বদেশীসভায় ভলান্টিয়ারিতে, ভণ্ডুলমামার বাড়ি চাপা পড়ে গেছে। এই পরিবর্তনের পাঠ যদি অন্যমাত্রায় হয়, তাহলে ওই ভণ্ডুলমামার বাড়ি ও স্বপ্ন ধ্বস্ত হওয়ার খবর ওই রাজনীতি রাখেনি। অনেকদিন পরে ভণ্ডুলমামাকে দেখে অবজ্ঞাই হয়—''এই সেই ছেলেবেলার ভণ্ডুলমামা'' স্বপ্নের গ্রাম উধাও। ওই ভণ্ডুলমামার কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ির বাস্তবই প্রকট। আর অবিনাশবাবু প্রাণবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের প্রতিভূ। ''রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত এক মানসরাজ্যের অধিবাসী।'' রাজনীতি ইত্যাদিতে উতরোল কলকাতা আর দূরে বিচ্ছিন্ন ক্রমঅবসিত গ্রাম। কিন্তু বিভূতিভূষণ তাঁর বীক্ষায় জানেন, ওই গ্রাম না বাঁচলে আমাদের এই এশীয় বাস্তবে মরবে শহর শহরতলি। অবিনাশবাবুকে ওই গ্রামেই ভণ্ডুলমামার কাছেই আসতে হয়। আদর্শবাদী যুবকের অচরিতার্থতা ও স্বপ্নভঙ্গ ভাঙাবাড়ির ইমেজে এসে মিলে যায় গ্রামের ট্র্যাজিক মৃত্যুর সঙ্গে।

এই সংকলনের আর একটি গল্প 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'। দ্রবময়ী নাম্নী সত্তরের কাছাকাছি এক নারীর গল্প। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটি সরল, দ্রব্যময়ী কাশীতে গিয়ে ধর্মকর্মে, ঈশ্বরচিন্তায় মন দিতে পারলেন না,

তাঁর গাই মুংলির জন্য ফিরে এলেন। এই সরল গল্পটির ওপরের আচরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকলে দেখা যায়, এ গল্পের বহুমাত্রা। বিভূতিভূষণ সেই মহৎ গল্পকার যিনি তাঁর ফর্মগত পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আড়ালে রাখতে পারতেন, এক অকপট সারল্যের আবরণে সামাজিক বাস্তবের সেই স্তরকে ধরতেন, যার মধ্যে প্রসারিত অর্থে রাজনৈতিক চিহ্নও থেকে যায়। গল্পের শুরুতে দ্রবময়ীর পাড়া ও বাড়ির কথা "পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড় বহু পুরনো আম কাঁঠালের বাগান। দ্রবঠাকরুণের বাড়ীর চারিধার বনে বনে নিবিড় সূর্যের আলো কস্মিনকালে ঢোকে না, তাঁর ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর দিনরাত 'যাঁওকে' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনে রাতে মশার বিন বিনুনি" এ কোন গ্রাম—বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রায় এক গ্রাম। এরপরই দ্রবময়ীর ম্যালেরিয়ার পালাজ্বর ধ্বংসের আর একদিক। দ্রবময়ী জ্বরের কাঁপনের মধ্যেই তাঁর গরুর জন্য উদ্বিগ্ন — যে ও বাড়ির ন' ঠাকরুণের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দ্রব্যময়ীর কথা বন্ধ হয় সেই খোঁজ নেয়, গরুকে এনে দেবার আশ্বাস দায়। দ্রবময়ী বাইরে থাকা নাতিদের জন্য অভিমানাহত। ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায় কাজ করা বড় নাতি একবার বৌ নিয়ে এখানে এসেছিল—কিন্তু মশায় পূর্ণ দিনমানে আলো না ঢোকা, কর্দমাক্তপথের গ্রাম থেকে তার মনে হয়েছিল : এখেনে কি মানুষ থাকে নাকি? দ্রবময়ী নাতির ছেলের স্নেহে জড়িয়েছিলেন, কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই মনুষ্যবাসের অযোগ্য এই স্থান থেকে তারা চলে যায়। বিভূতিভূষণের গল্পে এই অযোগ্য স্থানেই মানুষ থাকে, বাঁচে। বাঁচে শুধু নয়, এক অকৃত্রিম জীবনপিপাসায় বাঁচে। কাঁঠাল গাছ থেকে কেউ কাঁঠাল নিলে সব্বনেশে কলিকালে ধম্মোজ্ঞানের অভাব দেখে ক্ষুব্ধ হয়। এরপরই মায়ের মুখের অরুচি কাটাবার জন্য দ্রবময়ীর কাছে চাইতে আসা "একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ এগারো বছরের বালিকামূর্তি" অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াল। বর্ণনাটিতে গ্রামের রূঢ় বাস্তব। তারপর এল অতুল "আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেছে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমূল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে ?" এই উক্তি যেন আজকের। দ্রবময়ী জানিয়ে দেন, তাঁর নেই। পরে বলেন, না, আমি বেচব না। বিভূতিভূষণ দ্রবময়ীকে এভাবেই এক মানবিক প্রাকৃতিকে স্থাপন করেন। গাছপালার ওপর বড় মায়া, না খেয়ে থাকলেও গাছ বেচবেন না এ তো এক মূল্যবোধ। এক সবুজ প্রত্যাখ্যান। এ বেলাও সেই বালিকা আসে নেবু নিতে—দ্রবময়ী তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটাতে চান ওই বালিকার সামনে আপনমনে বকে, সেই নাতির ছেলের কথা বলে নেবু দেন। আর সে সময়ই মেজ নাতি নীরদচন্দ্রর আগমন। সাহেব ছুটি দিতে চায় না বলেই দ্রবময়ীর চিঠি অনেকদিন পেয়েও সে আসতে পারেনি—পরের চাকরি। ওই সাহেব, পরের চাকরি, দ্রবময়ীর ধ্বংসস্তূপে বাঁচা, এসবের মধ্যেই অন্তঃসলিলা উপনিবেশিক গল্প। নীরদচন্দ্র, দ্রবময়ীকে কাশীতে নিয়ে যেতে চায়—এক বন্ধুর মার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকবে। দ্রবময়ী গেলেন, যাবার আগে প্রিয় মুংলি গোরুর ভার দিয়ে গেলেন ন'বৌকে। আর সেই বালিকা কনককে এক বোঝা পাকাঠি : ঠাকমাকে মনে রাখবি তো!

গল্পের দ্বিতীয় পর্যায় কাশী পর্ব। বন্ধুর মা নীরজা ও দ্রবময়ী—একজন গুরু-মঠ-ধর্মে, সংসারে আর মন রাখতে চান না, এমনকি ছেলের বিয়েতেও যান না। আর দ্রবময়ী একেবারে মানবিক, ওই ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রাম ও প্রকৃতির মধ্যে থাকা একজন মানুষর যা জীবনাবেগ সব কিছু ছাপিয়ে। দ্রবময়ী রামকৃষ্ণরও নাম শোনেনি—তিনি রামকৃষ্ণ, রাধা, দুর্গাকে জানেন, দ্রবময়ী গীতা, "নিষ্কামকর্ম এসব জানেন না। জানেন ব্রতকথা পাঁচালি। ধ্যান নয়, রাত্রে মোহনভোগ খাওয়ার ভাবনায় তিনি ভাবিত। নীরজার কাছে, দ্রবময়ী নাস্তিক। দ্রবময়ী কাশীর ধর্মকে সহ্য করতে পারেন না। নাতি এসে প্রশ্ন করে তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাকমা? ওই ধর্মের জগতে এ জগৎ মায়া ভাবার জগতে দ্রবময়ী, এক প্রায় ধ্বংসপুরীতে বাস করা দ্রবময়ী মন্ত্র, কথক ঠাকুরের গানের মধ্যে চলে যান তাঁর খয়েরখাগী গাছে, আমগাছে। স্বপ্নে আসে গোপীনাথপুরের ভিটে, ছলছল চোখে মুংলি। গুরুদেব আসার আগেই দ্রবময়ী এ জন্মকেই জানেন, ধর্মের মায়া নয়, এ জীবনের পিপাসাতেই তিনি বাঁচেন। দ্রবময়ী কখন যেন হয়ে ওঠেন ওই উপেক্ষিত জীবনপিপাসার প্রতিমা—উপনিবেশের প্রক্রিয়ায় বিধ্বস্ত বাস্তবের এক প্রতীকী চিহ্ন। উঠোনের মৃত্তিকাই তাঁর জীবনের ক্ষেত্র।

'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' একটি প্রেমের গল্প, রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি'র মতো এ গল্পেরও সময়কাল দীর্ঘ। হীরেন ও কুমী—দুজনারই চরিত্রবৈশিষ্ট্য একদিক থেকে এক—দুজনেই বকতে ভালোবাসে। হীরেনের বাবারও এই রোগ ছিল। বাইশ বছরের যুবক হীরেন আপিসে কাজ করে আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। দূর পাড়াগাঁয়ে পিসিমার বাড়ি গিয়ে হীরেনের সঙ্গে কুমীর দেখা হয়। কুমীর বাবারও বকুনি প্রতিভা ছিল, কুমীও সেই বাকপ্রতিভার অধিকারিণী। এই বকুনির জন্য হীরেন ও কুমীকে, হীরেনের বাবা কুমীর বাবাকে সকলেই এড়িয়ে যেতে চাইত। ওই বৃদ্ধা পিসির বাড়িতে হীরেন ও কুমীর শুভক্ষণে দেখা হল। গল্পটির রহস্য এই বাকবহুল এ দুজনের ভালোবাসা কিন্তু প্রায় নিরুচ্চারিত নিঃশব্দ। কুমী বা কুমুদিনীকে দেখে, সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছাক্রান্ত হীরেনের ভালো লাগল—রামকৃষ্ণ মঠের লোকেরাই সন্ন্যাসী হওয়াকে নিরুৎসাহিত করে কারণ এই বকুনির ঠেলায় মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে। যে হীরেন পিসির বাড়ি আসত না, পিসির কোনো কাজও করত না, সেই হীরেন পিসির কাছে আসতে শুরু করল। কুমীর সঙ্গে সময় কাটায়—কুমীর মা ভালো চোখে দেখে না। অথচ হীরেন কুমুর মতো মেয়ে দেখেনি—কী বুদ্ধি, কী রূপ, কী বলবার ক্ষমতা, হাত নাড়ার ভঙ্গি, লঘুগতি চরণ ছন্দ। কিন্তু বিবাহ হয় না—কারণ কুমীরা কুলীন আর হীরেনরা বংশজ। হীরু রেগে যায়—ডেকে অপমান ঘরে আনতে কে বলেছে? কুমীও বলে, বয়েই গেল, সে কি বিয়ে করতে পায়ে ধরতে গিয়েছে।

এর মধ্যে হীরেন চাকরি করতে গেল, কাকার এক বন্ধুর সুপারিশে জামালপুরে। দূর পাড়াগাঁয়ের কুমী সময়ের মাটিতে চাপা পড়ে যেতে লাগল। কাকার বন্ধুর ছেলে মণি বি এসসি দিয়েছে। তার ইচ্ছে সায়ান্স কলেজে রমণের কাছে ফিজিক্স পড়ে, বাবার ইচ্ছা সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। বাবার সঙ্গে তার মনান্তর চলছে। তার সঙ্গে হীরেন মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। নীল অতসী ও বন-তুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়, ঘন ছায়া নেমে আসছে পূর্বদিকে শৈলসানুতে, একটি

বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেছে। সমতল মাঠ, ভূট্টার খেত, পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও কাশবন থই থই করছে। রেলের কারখানার চাকরি যে ভালোবাসাকে আড়াল করেছিল, এ প্রকৃতি তার নিঃশব্দ সৌন্দর্য উপুড় হওয়া মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ সেই আড়ালকে ভেঙে দিল। একটা বেদনার মতো কুমীর চোখের, হাত নাড়ার, কথাবালার স্মৃতি শব্দহীন হয়ে দেখা দিল। আর হীরেনের মনে হল, কুমীকে জীবনে সুখী করে যেতে হবে। প্রকৃতিই বিস্মরণের পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলল। হীরেন আবার সেই গ্রামে ফিরল নানা ধরনের পাত্র এনে, কুমীর সঙ্গে বিয়ের চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হল না। কুমীর বাড়ির লোকেরাও তার সম্পর্কে আস্থাহীন—লজ্জায় পিসিমার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিল। বছর দু-তিন কেটে গেল।

হীরুর চাকরিতে খুব উন্নতি হল এ সময়ে। হীরু আর সে হীরু নেই। দেখা হল সুরমার সঙ্গে। আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হল—সুরমার মুখখানা কী সুন্দর—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো। সুরমাকে বিয়ে করল হীরু। এরপর সে কয়লার ব্যবসা শুরু করল। ক্রমে বড় কন্ট্রাক্টর —তার চালচলন বদলে গেল। হঠাৎ একদিন সেই পিসিমার চিঠি এল—তাঁর ইচ্ছে হীরুর সঙ্গে কদিন থাকেন, মুঙ্গেরে দু-বেলা গঙ্গাস্নান করেন। হীরু আবার এল সেই গ্রামে। ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গেছে অতিবৃষ্টিতে। "অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নীচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুন নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড়ো বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে। ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেত ঝোপ কড়কড় নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।" এ শুধু প্রকৃতি বর্ণনা নয়—হীরেনের অতীতে, গ্রামে, চাপাপড়া ভালোবাসার জগতে প্রবেশ। 'দ্রবময়ীর কাশীবাসে যেমন দ্রবময়ী কখন বাংলাদেশেরই জীবনপিপাসু প্রতিমা হয়ে ওঠেন, তেমনি কুমুদিনী কুমীও। সুরমা তখন অবাস্তব শূন্যে। গাছপালায় ঘাসে পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁকের ডাকে কুমী মাখানো। অন্ধকারে আচমকাই কুমুদিনীর সামনে হীরেন।

হীরেন ও কুমুদিনীর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত এক টান-ভালোবাসার সম্পর্কে দাঁড়ায়—"হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটি সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা... এ এক অদ্ভুত মনের ভাব।" কুমী কথা বলে যায়, বলে পুরোনো কথা—আলেয়া... আলেয়াই বটে। হীরুকে খেতে দেয় পান্তাভাত নারকেল কুমড়ি, কচুর শাক। ভুলে যাওয়া ভালো লাগার রান্না সব। কুমীর সেই ছেলেবেলা কি ভালো লাগে? কুমীর সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়—সে কি ও কথার উত্তর দিতে পারে? কুমী বদলায়নি, হীরেনই বদলেছে। আবার বদলায়ওনি। সূক্ষ্মবুদ্ধির অহংকারী হীরেন কি কিছু বুঝতে পারে না? অজস্র বকার আড়ালে ওই উত্তর তো নিঃশব্দ থাকে। হীরেন চলে যায়, কুমীই সব গুছিয়ে দেয়। দু-পারে নদীচর নির্জন। দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল, মেঘলেশহীন। কালকাসুন্দি গাছের বন, কচুরিপানার বেগুনি ফুল, বন্যার জলে নিমগ্ন আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থর থর কাঁপছে। হীরু পিসিমাকে নিয়ে নৌকায়—এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত। কুমী : "আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?" কুমুদিনী ওই প্রকৃতি ওই কথা, ওই জীবন নিয়ে এক ভালোবাসার নীরব

উচ্চারণ নিয়ে তাকে কি আমাদের মনে পড়ে? সব বদলায় আবার বদলায় না। থাকতে চাইলেও থাকা যায় না। এ থাকার জন্য তো চাই অন্য মন, অন্য বাস্তব। এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা বড় কঠিন।

বিভূতিভূষণ তাঁর বাস্তবে দেখেছেন নানাবিধ মৃত্যু। বলা যায় দেখেছেন বাস্তবেরই মৃত্যু। আর এই বাস্তব তাঁর গল্পে অনেকে ক্ষেত্রেই নারী। এ সংকলনের ''মৌরীফুল'' গল্পে যেমন তেমন 'পুঁইমাচা' গল্পে। তিনি জানতেন, মৃত্যুচেতনা আসলে জীবনচেতনাই। 'পুঁইমাচা' গল্পে মৃত্যুর সীমা ভেঙে এক জীবনের কথাই বলা হয়েছে—গল্পে চিংড়িমাছ ও পুঁইশাক নিয়ে যে উত্তাপ ও ভালোবাসা, তাই ক্ষেন্তির মৃত্যুর পরেও অন্যভাবে জেগে থাকে। এ গল্পে যেমন থাকে আমাদের সমাজের নির্মমতা তেমনি আছে অসহায়তা তার সামনে। গল্পটিতে শীত আছে, পিঠে পার্বণ আছে, পুঁইশাক আছে, বসন্ত আছে। ক্ষেন্তি যেন প্রকৃতি। তার যাবার সময় চেলির আঁচল মেদিফুলে অবনত হয়। ক্ষেন্তি বলেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে আষাঢ় মাসে তাকে আনতে। কিন্তু আনা হয়নি, বিয়ের সময় আড়াইশো টাকা বাকি থাকার জন্য ক্ষেন্তি মারা যায়। গল্পটি এমন ভাবে বলা হয়েছে, ক্ষেন্তি শুধু সহায়হরি অন্নপূর্ণার মেয়ে নয়। এ যেন শীত-বসন্তর জীবন, এক ঐতিহাসিক সামাজিক সত্য।

আবার শীত আসে, আবার পৌষ পার্বণ। স্মৃতি তাড়া করে খুব জ্যোৎস্নায় আর সেই'' লোভী মেয়েটি মৃত্যু পেরিয়ে এসে যায়। জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে কাঠঠোকরা পাখির শব্দ। সে স্বরও তন্দ্রালু স্মৃতি-সময় সেই স্বরে। ক্ষেন্তি নেই, পুঁটি অন্যমনস্কভাবে বলে ওঠে—পিঠে দিদি বড় ভালোবাসত। ওই ভালোবাসার অজ্ঞাত স্মৃতি পেরিয়ে এক ইতিহাস, প্রাকৃতিক মানবিক ইতিহাস জ্যোৎস্নার আলোয় জেগে ওঠে, দারিদ্র্য, বদ্ধনির্মম সমাজকে উপেক্ষা করে জীবনের উদ্ভাস ''পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে সুস্পষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'' প্রকৃতিই এখানে মানুষের প্রতিরূপঃ সমাজের বিকার মানুষ ক্ষেন্তির হত্যা করেছে প্রায় কিন্তু তাকে তুচ্ছ করে তারই রোপিত সবুজ জীবনের প্রবহমানতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে—উপনিবেশিক অব-উপনিবেশিক বাস্তবের মধ্যেই যেমন জীবনধারা অব্যাহত থাকে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ''আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' র মতো গল্পের প্রাসঙ্গিকতা না বোঝার কোনো কারণ নেই। গল্পটির ব্যঙ্গ তীব্রভাবে আজ বেঁধে। এ গল্পের খাঁজে খাঁজে, এর বিভিন্ন কুশীলবদের আচরণে যে বাস্তবকে বিভূতিভূষণ ধরেছিলেন, তা আজ আরও প্রকট। আইনস্টাইনের অর্থাভাব মেটাতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ভারতে আসা, নাৎসীজার্মানি থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর—ওই নির্বাসন বাস্তব ঘটনা আর ভারতে আসা যেন কল্পকাহিনি। সেই সঙ্গে আইনস্টাইনের ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে জানার ইচ্ছা—গল্পটিতে আইনস্টাইনের ছবিটিও লক্ষণীয়। তিনি নিজেকে কল্পনাবিলাসী বলছেন, প্রশ্ন করেছেন ''কেন, আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের একত্র মিলনকে আপনি কল্পনার ছাঁচে ঢালাই করা বিবেচনা করেন না নাকি?'' আইনস্টাইনকে মফসসল শহরে এনে বক্তৃতা দেওয়ানো ও কিছু অর্থ তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আয়োজন কৃষ্ণনগর কলেজের গণিতের অধ্যাপক রায়বাহাদুর

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় করেন। দার্জিলিং যাবার পথে আইনস্টাইনকে রাণাঘাটে নামাবার কথা ভাবেন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করতেও শুরু করেন। এই ব্যবস্থা করার বৃত্তান্তটিও মধ্য শ্রেণীর বাঙালিকে উদঘাটন করেন। কিন্তু দেখা গেল যেদিন রাণাঘাটে আইনস্টাইন আসবেন সেদিনই ওই শহরের বাণী সিনেমায় আসছেন স্বনামধন্য চিত্রতারকা ইন্দুবালা। বিভূতিভূষণ এই আসার বিজ্ঞাপনটি পুরোটা দিয়েছেন। নীল/কালো/কালো/লাল—এভাবে অক্ষরের রংগুলিও বলেছেন—ওই রং বড় মারাত্মক, নীল কালো-লাল আজও বড় ভয়ংকর। বিভূতিভূষণ উপরিবাস্তবকে ভেঙে আইনস্টাইন, আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার এক শীর্ষ ব্যক্তিত্বকেই আনেন। তাঁর সভা শূন্য—ওই শূন্য কক্ষ আমাদের বাস্তবের সমাজের প্রতিচ্ছবি। ইন্দুবালার জন্য ভিড়কে আইনস্টাইন ভুল ভাবেন—ইন্দুবালার বাদুড় নৃত্য এখন আরও প্রসারিত, ঘরের মধ্যে। ওই বাদুড় নৃত্যের কাছে অবনত মিডিয়া ধর্ষিত সমাজ। ভিড় দেখে আইনস্টাইনের মনে হয়েছিল, এরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। স্থানীয় ইউনিভার্সিটির। রায় বাহাদুর ভুল ভাঙালেন না—''রাণাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি। হায়রে এ দেশ কোন দেশ তো ইনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সবই ইউরোপ নয়।'' শূন্য সভাকক্ষ থেকে আইনস্টাইনও চলে আসেন সেখানে যেখানে ইন্দুবালা তার ''মিলন'' ছবির গান গাইছেন। জংলা হাওয়া চমক লাগায়। সংবাদে প্রকাশ, আলুর দাম বাড়ছে, ধানের দাম কমার দিকে, ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। আর বাণী সিনেমায় সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি উচ্চাঙ্গের শিল্পসংগতি প্রদর্শন করেছেন, তা রাণাঘাটবাসী কোনোদিন ভুলবে না। এটাও জানানো হয় বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন দার্জিলিং যাবার পথে মিউনিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নেমেছিলেন, তাঁকেও বাণী সিনেমায় ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়েছিল। এই গল্পে আইনস্টাইনকে ওই হলে খাতির করেই বসানো হয়। তীব্র ব্যঙ্গ তার সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণাও যেন গল্পটিতে—আজ তো এ গল্পে আরও প্রাসঙ্গিক। তথ্যপ্রযুক্তির দাপটে আইনস্টাইনকেও আসতে হয় ওই বাদুড় নৃত্যের কাছে—শূন্য প্রেক্ষাগৃহ, আমরা করুণ কুশীলব।

এই সংকলনের ষোলোটি গল্পের মধ্যে চারটি গল্প সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য থেকে এটুকু বোঝা যায় বিভূতিভূষণের গল্পের জগৎ কত বড়। একেবারে বাস্তব, মূর্ত মানুষকে তিনি শিল্পের বাস্তবে দেখিয়েছেন এক বহুমাত্রিকতায়, আপাত ঘটনাহীন জীবনের মধ্যেই কত ধরনের মানুষ, এক মানুষের মধ্যে কত মানুষ। বিভূতিভূষণ যেন এক খননের মধ্য দিয়ে প্রত্নতাত্বিকের মতো মানুষগুলিকে আবিষ্কার করেছেন। গল্পের জটিল নির্মাণ তাদেরই করে তুলেছেন ইতিহাস— প্রাকৃতিক মানবিক এই মানুষেরাই তো দীর্ঘসময়ের ইতিহাসের নির্মাতা, আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনের ভাঁজে ভাঁজে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জড়িয়ে থাকে।

আমরা গত দেড়শো দুশো বছর ধরে এক উপনিবেশিক ক্ষয়ের জগতে। আজও সেই ক্ষয় অব্যাহত তবে ওই ক্ষয়ের রূপ পাল্টেছে। একটা প্রতারক চোখ ঝলসানো দাহ আছে। আসলে আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে বিচ্যুত। ধার করা ইতিহাসে বাঁচতে চাইছি। বিভূতিভূষণের গল্প এরই প্রতিপক্ষে দাঁড়ায়। ওই ক্ষয়ের অবসাদের বাস্তবকে সামনে রেখেই তিনি তার মধ্যে খুঁজতে চান সেই

মন্ত্র যে মন্ত্রে মানুষ বাঁচে, সংখ্যায় বাড়ে, জীবনধারাকে প্রবহমান রাখে। এই অন্বেষণ প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক নয়। কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে এটাই তো রাজনৈতিক—মানুষ বেঁচে আছে কীভাবে। প্রকৃতির মতোই মানুষকে দেখেছিলেন বিভূতিভূষণ—তাঁর প্রকৃতিও মানবিক ও ইতিহাসস্পৃষ্ট। এ কোনো রোমান্টিকের স্বপ্নপ্রয়াণের প্রকৃতি নয়, এ প্রকৃতি দারিদ্র্য অনাহার অর্ধাহারের যন্ত্রণাকে পেরিয়ে যেতে হাতে রাখে। আজকের চর্তুদিকে ভয়ানক ভাঙনের শব্দে যখন দিশাহারা হই, তখন বিভূতিভূষণের গল্পের জগতে প্রবেশ করলে সেই ভাঙনের অবসন্নতা মানুষের উত্তাপে, আবিষ্কারে কোথায় চলে যায়। সাধারণ মানুষের আবিষ্কারে, তাদের আপাত তুচ্ছতার মধ্যে বৃহৎকে পাওয়ায় যেন দেশ আবিষ্কারই ঘটে। আর এই আবিষ্কার এমন শৈল্পিক বাস্তবে ঘটতে থাকে, এমন সতর্ক নির্মাণে দাঁড়ায় যে মানুষগুলি তার সময়ের নিগড়ে বাঁধা থাকে না। তারা শিল্পের মিথ্যায় ও স্বাধীনতায় আরও 'সত্য' হয়ে উঠে আমাদেরও মুক্তি ঘটায়। বিভূতিভূষণের গল্পের জগতে প্রবেশ করে পাঠক তার বাস্তবকে যেমন উপলব্ধি করে তেমনি তাকে অতিক্রম করে এক উত্তরণের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ হয়, জীবনের উত্তাপে ভালোবাসায় বাইরের পঙ্গুত্বকে প্রতিহত করার শক্তি অর্জন করে। এ জগৎ এক বাঁচবার জগৎ। তাই এ জগতে বার বার ফিরে যাই। ফিরে যেতে হয়।

গল্পক্রম

ভণ্ডুলমামার বাড়ি

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

একটি দিনের কথা

তালনবমী

আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

পুঁই মাচা

দ্রবময়ীর কাশীবাস

ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল

অসাধারণ

রাসু হাড়ি

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

হিঙের কচুরি

বে-নিয়ম

ডালুর বিপদ

ভণ্ডুলমামার বাড়ি

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটবেন তার সম্ভাবনা ষোল আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁতগাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরীব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু....

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেনলি—ওরে ও কানাই, শোন, শোন যা দিকি, একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম ক'রে বলগে, দুটি গরম মুড়ি যেন ভেজে দ্যায়—এক্ষুণি....

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা....

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়! ...এখানকার লোকজন দেখেচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এই জন্যে যে কোন রকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে! কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই নে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি...

দেখলাম অবিনাশবাবু, কলেজের দিনগুলোর কথা এখনোও ভুলতে পারেননি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই

শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরে তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন? এখন নেই?

—সে কথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম-কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্ছে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও ও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হ'ল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় ভাঁটশেওড়ার গাছ গজিয়েছে, চুন-শুরকী মাখার ছোট খানাতে পর্যন্ত বনমূলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে। ....ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্ছে না।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম, ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?....

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যে বাড়ির ভাগ্নে, চাকরি-বাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর শুরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম,—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে? ....না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল? তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, শুনবি-নে তো আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েচে—তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার!

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হ'ত সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়া বনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছিলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয় নি, বনে-জঙ্গলে একেবারে ভর্তি, ইঁটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারে নি আর!

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্রমাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজী করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা।

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কি রকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারি নে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয় নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় মিস্ত্রী আসে নি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাল্গুনে ফুলের খই ফুটেছে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে...ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না....ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বলবে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে

রোয়াক হয়েছে কবে আমি দেখি নি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানলায় এখনও কপাট বসানো হয় নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাসকতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেছে রত্নদত্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাই নে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে.....বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েচে বলে মনে হয় না....একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কতবার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্তি....

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এন্ট্রেন্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েছি।

বোধকরি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের ঘরে জানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন,—এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলাণ্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদলে—তখন মনের কোন গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরানো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েচে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন কলেজে পড়ি, কোন মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড় ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না?

ভণ্ডুলমামা বললেন, আনব, শিগগীরই আনব বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই... সেইজন্যেই তো খেয়ে না খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী

আছে....তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও....এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি! এখনও বাকী! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছাঁ-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চৌদ্দ পনেরো বছর ধরে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেলবো। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বললেন তো চৌদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে....যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে....শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে....ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বললেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমায় দেখলে খুশী হবে। সামনের রবিবার তোমার নেমতন্ন রইল, অবিশ্যি, অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন,—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি,—তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে তো মানুষে....তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বট অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকী। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয় নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে, এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আসতে হয়, দেখাশুনো করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন। .... পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে.....সামনের বর্ষায়....ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম! তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাকলে বাড়িখানা তো থাকবে না—আর এককালে না-এককালে ছেলেদের তো এসে বসতেই হবে বাড়িতে। কলকাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন —এই রকম ক'রে চেয়ে চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাই নে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানাও মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু একদিকের দোতলা-সমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পূজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরু-বাছুর কচুরীপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হতে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারি নি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা, এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে! ...শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি। আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় শখ হ'ল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে বলে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি...

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটা, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললেন—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজী নন। বুদ্ধিশুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে—পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরী করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপর ভণ্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখি নি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করে নি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাই নি, হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখি নি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানালার কপাট নেই, থামে থামে কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে!...

আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য যে, পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। অফিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশী কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু'একটা কথাই কারো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহ দেন নি; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল! বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পূজো করতে যেতেন, আগডুম বাগডুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধ'রে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল।

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল-বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটে নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো-চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিলখিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপ্পর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে —

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?— হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়ীতে ছাগল ঢুকে নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজোনো হ'ল, হালুয়া তৈরী হল, পেয়ালার ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি?.....

কুমী বিস্ময়ের সুরে বলল—কে পিসি?

—তুই চিনিস নে, আমার বড় জেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরী করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ী তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল! দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ! দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখিনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ী থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময়ে দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠল; যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করল।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ী বেড়িয়ে আম খেয়ে ফুর্তি করতে। সে জষ্টি মাসের দুপুর রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদিন বললে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েচে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ী ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ী থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়,

নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি— ; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ামুখী মেয়ে, এই ভর সন্ধেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে!—হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ী আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের

একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন যাচ্চে আসচে। শান্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক ঝক শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিন-রাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনান্তর চলচে। হীরু জানত এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে, নীল অতসী ও বন-তুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূর্বদিকে শৈলসানুতে, একটির বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধচে—পূবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্মো-ফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার ক'রে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্কভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই।

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় থেকে উদ্ধার করো না —তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেছি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি.... সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন; তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পুজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমার আর ঢোঁক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি। আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিকে বলতে পারলে না,

তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেনেই তিনি খুলনায় তার শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি ক'রে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ, একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশি হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বেরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি আসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে...হাত-পা নেড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেচে...নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি.....

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেল। নতুন এম-বি পাস ক'রে জামালপুর প্র্যাকটিস করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে রাজী করলে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হ'ল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দিতে পারবো কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল তো? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বললে—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্যে তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুরমতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা! আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ কথা শোন—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ—দিন দিন ইয়ে হচ্চেন—না? ওঠ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না ক'রে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে গেল, সাজানো গোজানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হ'ল, কিন্তু ফল সামান্যই দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবো ব'লে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক। কুমীর জন্যে এত চেষ্টা ক'রেও কিছু দাঁড়ালো না শেষ পর্যন্ত! কি করা যায়? এদিকে কুমীদের বাড়ীতেও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েচে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড় বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিলে।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকুরিতে খুব উন্নতি ক'রে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ ইঞ্জিনীয়ারের আপিসে বদলি হ'ল দেড়শো টাকায় মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, তিলে তিলে মানুষের দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্ছে—অবশেষে পরিবর্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হ'লে আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প ক'রে সে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্তমানে। এর মূলে একটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার ইনস্পেক্টার

ছিলেন, তাঁর বাড়ী হুগলী জেলায়, রুড়কীর পাস ইঞ্জিনীয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর ছটি মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়েচে। এখনও একটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল! সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা ব'লে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গান শোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হ'ল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটি—পরেই ভাবল—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হ'লো—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। না, কি ভাবনা এসব, মন থেকে এসব জোর ক'রে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হ'লে আজ গেরুয়াধারী স্বামীজিদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্তি হয়ে যেতো। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি, শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে অমূল তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন; রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়ীকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্যে; প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ'সাত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেল কারখানায় কয়লার কন্ট্রাক্ট নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালো ভাবেই নামল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কন্ট্রাক্টার হয়ে পড়ল। শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলনও বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করেনি—তবে বলতে শুরু করেচে মোটর না রাখলে আর চলে না; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্যে নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না; বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বললে—আসতে যখন চাইচেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন এখানেই গঙ্গাতীরে থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না, যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেই হীরুই দেশে রওনা হলো।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদলা নদীতে নৌকোয় ক'রে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়ালবাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোর বুড়ো মাঝি বললে সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিত্রাঙ্গপুর গ্রাম দু'খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নিচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুণ নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড় বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে। ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড় কড় ক'রে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকো ভিড়তে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উঁচু বলে কুল ছাপিয়ে জল ওঠে নি; দু-পাড়েই বন, একদিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্য পাড়ে খররৌদ্র। ...এই বনের গন্ধ....নদীজলের ছলছল শব্দ....বাঁশবনে সোনার সড়কীর মতো নতুন বাঁশের কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেচে....এই শরত দুপুরের ছায়া...এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটিমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়...অনেকদিন আগের মুখ...হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে...এক ধরণের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি!... জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তার একচ্ছত্র অধিকার এখানে—সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনে না।

হীরু নিজেই অবাক হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ি হয়ে গিয়েছেন, তবে এখনও অথর্ব হন নি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর জন্যে ভাত চড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে খাব। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি বলি করেও কুমীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা পড়লে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। মধু ডাক্তারের চুল-দাড়িতে পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে—সেই রকম নিজের অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টার মহিমবাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব-ইনস্পেক্টারী করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোনবার মক্তব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভঙ্করীর সারাকালির একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে—বসো হে হীরু, সন্ধ্যেটা জ্বালি —তারপর দু-একহাত খেলা যাক। এখন না হয় বড়ই হয়েচ, পুরোনো দিনের কথা একেবারে ভুলে

গেলে যে হে!

হীরু পথশ্রমের ওজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল। তার শরীর ভাল নয়, পুরোনো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ী। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ীর সামনেই এসে পড়েচে। সেই জিউলী গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছে-পালায়, ঘাসে-পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁকের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ী বসে সে কত গল্প করেচে কুমীর সঙ্গে!

চুপ করে সে জিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসচে! কুমীদের বাড়ীর কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল....আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই কুমী? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই বটে, কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েছে সে!

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে—কুমী কেমন আছ? চিনতে পারো?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না, বললে—কে?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তারপর এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলে হীরুদা? কোথায় ছিলে এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরণে একখানা আধময়লা শাড়ি—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতূহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, মুখশ্রী কিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ী হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক'বছরের কত কথা জমানো রয়েচে, তোমায় বলব বলব করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে আর এলেই না।

হয়েছে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরোনো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেছে; হীরু ভাবলে, আহা, ওর বকুনির শ্রোতা এতদিন পায়নি তাই ওর মুখখানা ম্লান।

—তুই আগে চল কুমী।

—তুমি আগে চল, হীরুদা।

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বললে —ওই মা এসেচে!

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই! মা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় গিয়েচে রায়-বাড়ী, কাল ওদের লক্ষ্মীপূজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দীঘির-পাড় থেকে। উঃ —কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো, বসো। কি খাবে বলো তো? তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালোবাসতে। বসো, সন্দেটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে। দাঁড়াও, আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্চে পুরোনো দিনের মতো, যখন সে কত রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ী বসে গল্প করতো। তবুও কত—কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে চাল ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসল সেই পুরোনো দিনের মতোই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনি—সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বললে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হ'ল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বলল, ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার জো নেই, কাজ ফেলে এসেছি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না, না হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দু'দিন। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখন এমন মনে পড়চে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে। বড় লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতো সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক থেকে মেলে—খাপ খায় এই কুমীর। অথচ সুরমার জন্যে দামী মাদ্রাজী শাড়ী কিনে নিয়ে যেতে হবে

কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেচে, যাচ্চ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পূজোর কাপড়-চোপড় কিনে এনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশি।

আর কুমীর পরণে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

না—দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেচে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েচে—নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্মের মধ্যে বালিকাবয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরোনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন ক'রে ফিরেচে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমী মা এলেন। বললেন—এই যে, জুটেচ দুটিতে? আমি শুনলুম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপূজো, তাই রায়েদের বাড়ী রান্না করে দিয়ে এলাম। তা ভালো আছিস বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে! তোর কথা লেগেই আছে ওর মুখে; এই আজও দুপুর বেলা বলছিল, মা, হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশি হোত; এবার তো বন্যা এসেছে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশি হোত—না মা? তা, আমি তুই এসেছিস শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ী নেই দেখে ভাবলাম সে ঠিক আমাদের ওখানে গিয়েচে। তা ব'স বাবা, চট করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্যে তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েচি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনের খাতা-পত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে! এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা, মেয়েটার পরণে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি ক'রে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহলাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্যন্ত। বললে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জ্বেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ী এসে ডাক দিলে—কি হচ্চে, ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপূজার অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ী। মা বললেন—যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ী গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো? ....উঁহু....তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্যে নারকেল কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ী পরেছে। বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়। তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুমীকে সে দেখচে তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুমী। ওর যেটুকু পরিচিত তা ওর মধ্যে থেকে বা'র হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা—এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুমীকে সে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুশি করবার জন্য।

কুমী কত কি বকচে বসে বসে...পুরোনো দিনের কথা তুলচে কেবল কেবল।

—মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে...সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস কেন পোড়ারমুখী, ভূত ধরে খাবে যে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো একরকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠে? শুনবে বলব...অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ....বলে ভয়ে মরচি—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়ে মরচো? হি হি—হি হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয় থাকতো না—চারুপাঠ তো আর পড় নি?

সেই সব পুরোনো গল্প। আলেয়া...আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েচে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুললে। আগে এসব কথা কুমী বলত না। এখন সে পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুয্যে-বাড়ীর বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবা নাতনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জনে মৃত স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দরদ দিয়ে বলে গেল। সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েচে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বললে—অই দেখো হীরুদা বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচবে তো মুখে? নেবু কেটে দেবো এখন অনেক ক'রে, নারকোল-কুমড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল—এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলেবেলা ভালো লাগে, না এখন ভালো লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে এক দিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভালো—নয় কি?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব?

—কে বললে একথা? মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে? ও বাজে কথা, জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব আলগা হয়ে গেছে।

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বলবিনে?

—ঐ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও—যত বাজে বকতে পারো —মা গো!...দাঁড়াও, পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি? ....না সে হবে না—

—দ্যাখ কুমী, আমার কাছে বেশি চালাকি করিস নে। তোকে আর আমি জানি নে? কোদলার ঘাটে পায়ে খেজুর-কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস নি, জানতে দিস নি কাউকে—

—আবার?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি ব'লে সে ভালো করে নি, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বা'র ক'রে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচ হীরুদা। তোমার যা কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হ'লে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বকতে? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারি নে ভেবেছিস?

—হাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না?

—আচ্ছা সে যাক, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি তুই খুশি হোস?

—উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি? কি বাজে বকতেই পারো?

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী? তুই এত বদলে গিয়েছিস আমি এ ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললে—তোমার কিন্তু একটুও বদলায় নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা, বেশ' বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ করা। আচ্ছা, কি বলব বলো দিকি? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর আমি দিতে পারি? ভেবে দ্যাখো তা হ'লে আমি বদলাই নি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা।

—আচ্ছা, কুমী এতটা না বকে সামান্য দু' কথায় সাদা উত্তর একটা দে না কেন? বকুনিতে আমি কি তোর সঙ্গে পারব?

—না, তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না। হ্যাঁ, হই।

—মন থেকে বলচিস?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না! তুমি না নিজের বুদ্ধির বড় অহঙ্কার করতে?

—কুমী, রাগ করিস নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েচ। যাক, বাঁচলুম কুমী!

—পায়েসটা খাও তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষান্ত রাখো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্যে।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্যন্ত এসে ওদের নৌকোতে উঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েছে তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে।

দু'পাড়ের নদীচর নির্জন! দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরি-পানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙ্গার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঝোপের তলার ছায়ায় ডাহুক চরছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপছে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েচেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ণ। নৌকোয় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধু ডাক্তারের মতো হাটতলায় ওষুধের ডিসপেনসারি খুলে? ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পূজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে....অন্ততঃ দেড়-শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়ে এসেছে...

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো! জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবছে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমন্তন্ন খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই।...

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?...

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে...ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো! ...আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা ব'লে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়...কই...

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই স্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েছে। সিগন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেনটা আসবার দেরি নেই...

একটি দিনের কথা

একটিমাত্র দিনের কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার বটে, কিন্তু তার পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। সেটা না বললে ব্যাপারটা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও নীচতা নিয়ে প্রকাশ হবে না। তাই একটু আগে থেকেই বলি।

একবার কলকাতা থেকে অনেকদূর একটা পাড়াগাঁয়ে আমার এক বন্ধুর ভ্রাতার জন্যে মেয়ে দেখতে যাই। যাঁদের জন্যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাঁরা এসে আমায় বড় ধরাধরি করলেন যে, আমায় তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে, কারণ ঐ গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকায় সেখানকার অনেকেই আমার পরিচিত এবং আমি নিজে বারকতক সে গাঁয়ে গিয়েছি, এ খবর তাঁরা জানতেন।

অগত্যা তাঁদের সঙ্গে যেতে হোল। জায়গাটা নিতান্তই পাড়াগাঁ। আমি সেখানে এর আগে দু-একবার গেলেও আমার সেই আত্মীয়ের পাড়াটি ছাড়া অন্য অন্য পাড়ার লোকদের ভাল চিনিনে, বিশেষ কারো নামও জানিনে। যাঁদের বাড়িতে মেয়ে দেখার কথা, তারা এই অপরিচিত দলের লোক। প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষেই তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হোল এবং তাঁদের বাড়িতে এই আমি প্রথম গেলুম। মেয়ের বাপের নাম গোপাল চক্রবর্তী, বয়স ষাটের কাছাকাছি, আগে কি একটা ভাল চাকুরি করতেন, এখন চোখের অসুখ হওয়াতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে পারেন না। ছেলেরা সব বড় বড়, মেয়েটিই ছোট। ভদ্রলোকের অবস্থা সচরাচর পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের যেমনি হয়ে থাকে তেমনি। বাইরে একখানা খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ, একটা পুরানো কোঠাবাড়ি, উঠানের এক ধারে বাঁশের বেড়ার মধ্যে গোটাকতক জবাফুলের গাছ, নারিকেলের চারা, কুমড়োর মাচা ইত্যাদি। এক পাশে গোয়াল ও কাঠ-কুটো রাখবার আর একখানা ছোট চালা।

গোপাল চক্রবর্তী আমাদের যত্ন আদর করলেন খুব। চা খাওয়ালেন জলযোগ করালেন। মেয়ে দেখানোও হোল—মামুলী প্রশ্নাদি জিগ্যেস করা ও মেয়ের তৈরী মামুলী পশমের আসন, হাঁস, তুলোর বেড়াল ও মাছের আঁশের কাজ ইত্যাদি দেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা উঠবার উদ্যোগ করলাম।

কথায় কথায় আমাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন—এই কি আপনার বড় মেয়ে?

গোপাল চক্রবর্তী বললেন—না, এটি আমার দ্বিতীয় কন্যা। (বিবাহের ব্যাপারে পাড়াগাঁয়ে কথাবার্তার সময় সাধুভাষা ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।)

আমি বললুম—বড় মেয়েটির কোথায় বিয়ে দিয়েচেন, চক্কত্তি মশায়?

—না, তার এখনও বিবাহ হয় নি।

মনে একটা খটকাও লাগলো। এই মেয়েটির বয়েস পনেরোর কম নয়। বড় মেয়েটির বয়েস সুতরাং কম হলেও সতেরো! অতবড় আইবুড়ো দিদি ঘরে থাকতে তার ছোট বোনের বিয়ের আয়োজন

উদ্যোগ—তবে কি বড় মেয়েটি কানা খোঁড়া বা ঐ রকম কিছু?

গোপাল চক্কত্তি তখনই আমাদের সন্দেহ দূর করলেন। তাঁর বড় মেয়েটির এক জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছে, পাত্রের বাড়ি আছে কলকাতায় হাতীবাগানে, পাত্র মার্চেণ্ট আপিসে চাকুরি করে। চক্কত্তি মশায়ের ইচ্ছে, শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই মেয়েরই বিয়ে দিয়ে তিনি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হন।

আমরা বিদায় নিলাম।

ওদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে কিছুদূর এসে বাঁ ধারে একটা পুকুর।

গ্রামের একটি ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, তিনি হঠাৎ পুকুরের বাঁধা ঘাটের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বল্লেন—ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হোল গোপাল কাকার বড় মেয়ে রাণী—যার কথা হচ্ছিল—

কি ক্ষণে না জানি মেয়েটিকে যে দেখলুম! কত ছবি চোখের সামনে দিন-রাত আসে যায়, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ফুলের মত তখন বেশ দেখায়, তারপর কোথায় যায় মিলিয়ে তলিয়ে, কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। লক্ষ অখ্যাত ছবির মধ্যে একটি কি করে যে মনের মধ্যে সেদিন স্থায়ী দাগ রেখে গেল! চেয়ে দেখি একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পুকুর ঘাটে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় নাইতে এসে তখনও জলে নামে নি, মোটামুটি সুশ্রী মন্দ নয়, গায়ের রংটিও ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী বটে। বাঁ হাতের একটা সাবানের পাত্র, একখানা রাঙা গামছা দুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে—কিছু না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—অথচ আজও যখন ছবিটা কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে এসে পড়ে—

যাক, ওসব কথা পরে বলবো—

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—মেয়েটি তো বেশ দেখতে, এই মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ হোলে খুব ভাল হোত। যে মেয়েটি দেখা গেল, তার চেয়ে এটি সত্যিই অনেক ভাল।

তারপর আমরা গ্রামের বাইরে মাঠে এসে পড়লুম—আমাদের সঙ্গের লোকটিও ফিরে গেলেন।

ওদের ব্যাপার আমি এই পর্যন্ত জানি। আমার বন্ধুর ভাইয়ের সেখানে বিয়ে হয় নি একথা আমি পরে অবিশ্যি শুনেছিলুম, কেন হয় নি সে খবর রাখবার আবশ্যক বিবেচনা করি নি। তবে শুনেছিলুম নাকি দেনা পাওনা নিয়ে কি একটা গোলযোগই সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার কারণ।

এর পরে বছরখানেক কেটে গিয়েছে।

একদিন সকালে আমার বাসায় জন কয়েক ছোকরা এসে হাজির হোল। তাদের সকলের বাড়ি ঐ গ্রামে—তাদের মধ্যে আমার আত্মীয়টির এক ভাইও আছে। সকলেই খুব ব্যস্তসমস্ত।

আমায় বল্লে—শীগগির নিন তৈরী হয়ে—চলুন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—

—কি ব্যাপার হয়েচে কি?

সকলেই সমস্বরে বল্লে—পথে বেরিয়ে শুনবেন, এখন বেরিয়ে পড়ুন চট করে—শ্মশানে যেতে হবে—কাশীমিত্তিরের ঘাটে—

খুব বিস্মিত হোলাম।

—কে মারা গিয়েচে? ব্যাপার কি?

আমার আত্মীয়ের ছেলেটি বল্লে—গোপাল কাকার মেয়ে রাণীর স্বামী আজ মারা গিয়েচে। এখানে বিয়ে হয়েছিল হাতীবাগানে—বিয়ের পর তিনমাস এখনও পোরে নি। আর একটি ছেলে বললে—তার চেয়েও বিপদ, রাণীর দেওর আর শাশুড়ীর ব্যবহার ভয়ানক খারাপ, তারা কেউ শ্মশানে যাবে না—মুখাগ্নি করতে হবে রাণীকেই—দেওর এখন চেষ্টায় আছে, নগদ টাকা, গহনা সরাবে, দাদার বৌকে ফাঁকি দেবে। সে ভয়ানক ব্যাপার, চলুন না, গিয়ে শুনবেন সব।

—আমরা কি জানতাম কিছু, আজ সকালে রাণীর সেজদা ললিত আমাদের মেসে এসে খবর দিলে যে, একা সে কিছু করতে পারচে না—আমরা তো গাঁয়ের একদল ছেলে মেসে আছি—বললুম—আমরা থাকতে ভয় কি? চলো যাই। ললিতকে তো ওরা বাড়ি ঢুকতেই দেয় না— দেওরটা এমনি করেছিল।

কাশীমিত্রের ঘাটে পৌঁছে দেখি রাস্তার দিকে পাঁচিলের এক কোণে একটা খাট নাবানো—তাতে চাদর-ঢাকা একটি মৃতদেহ। খাটের পাশে সেই মেয়েটি বসে আছে, যাকে সেবার ওদের গাঁয়ের পথের ধারে পুকুর ঘাটে নাইতে নামতে দেখেছিলুম সাবানের বাক্স হাতে। ওর পরনে রাঙাপাড় শাড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো, চোখেমুখে একটি দিশাহারার ভাব—যেন সে বুঝতে পারচে না, যে কি হচ্ছে বা কেন সে এখানে এসেচে। কিন্তু তার চোখে জল দেখলাম না। সেও যেন একজন এই ব্যাপারের নিস্পৃহ উদাসীন দর্শক আরও পাঁচজন বাইরের লোকের মত, এই রকম ভাবটা তার মুখে। খাটখানা এবং মেয়েটির চারিধারে ঘিরে কতকগুলি ছোকরা।

আমায় দেখে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল—এই যে এসেচেন? আপনাকে আনতেই বলে দিলুম আমরা। আমরা তো সব ছেলেছোকরা, একজন আপনাদের মত লোক উপস্থিত না থাকলে আমরা ভরসা পাইনে।

আর একটি ছোকরা বললে—দেখুন, এমন চামার রাণীর দেওরটা—ভাই মরে পড়ে আছে, সে সিন্দুক বাক্স সামলাতে ব্যস্ত। রাণীর তো দুর্দশা যে কি করেচে এই ক'দিন, এর দাদা না থাকলে বোধ হয় ওকেও ওই সঙ্গে মেরে ফেলতো। টাকার ভাগ, বাড়ির ভাগ ওকে দিতে হবে, এই আপসোসে মা আর ছেলে মরে যাচ্ছে। সে যদি দেখতেন কাণ্ডটা। আপনি যদি বলেন, আমরা চিতায় চড়িয়ে দিই মড়া। দেখুন, মুখাগ্নি করতে পর্যন্ত এল না ভাই—এই ছোট মেয়েটাকে দিয়ে সব কাজ করাতে হবে—সঙ্গে অন্য একটি মেয়েমানুষ পর্যন্ত নেই—ওর শাশুড়ীকে কত করে বললাম—এলো না।

মৃতদেহ চিতায় তুলে দিতে পরামর্শ দিলাম।

রাণীর দাদা তার হাত ধরে তাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালে।

মুখাগ্নি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে তার দাদা তাকে একপাশে বসালে। দু'একটি কথায় নীচু স্বরে বোনকে কি বলছিল, বোধ হয় সান্ত্বনাসূচক কথা।

এমন সময়ে একটি কাণ্ড ঘটলো।

কোথা থেকে তিনজন লোক এসে উপস্থিত হোল। একজনের বয়েস তেইশ চব্বিশ, বৃষকাষ্ঠের মত শুকনো চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সামনে পেছনে ঘাড়ের দিক চাঁচা। শখের থিয়েটার দলে ফুলুট বাজায়—চেহারাখানা এমনি ধরনের! বাকী দু'জন বেশী বয়সের লোক—কিন্তু তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, ওদের বংশে তিন পুরুষের মধ্যে কারো অক্ষর পরিচয় ঘটে নি, এমনি চাষাড়ে-চোয়াড়ে মুখ।

ছোকরাটি আসতেই মেয়ের দাদা বললে—এই যে আসুন ধীরেনবাবু—মাকে আনলেন না? ছোকরা সে কথায় কোনো জবাব না দিয়ে চোয়াড়ে ধরনের একজন লোককে দেখিয়ে বললে—ইনি আমার মামা! এঁকে নিয়ে এলাম, নইলে আপনারা তো আমার কথা শুনবেন না!

—কি কথা?

এইবার সেই মামা নিজে এগিয়ে এসে মেয়ের ভাইকে বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু এদিকে আসুন। মেয়ের ভাই তার সঙ্গে এক পাশে গেল। দুজনে কি কথা হল জানিনে, ভাই ফিরে এসে আমার দিকে চেয়ে বললে—ইনি রাণীর মামাশ্বশুর। ইনি বলচেন রাণীর গায়ের গহনাগুলো দিতে ওঁর হাতে। আপনি কি বলেন? এই কথাতে মামাশ্বশুরের সঙ্গী সেই আর একজন চোয়াড়মত লোক চটে গেল। বল্লে—উনি কি বলবেন? মেয়ের মামাশ্বশুর আর দেওর নিজে এসে গহনা চাইচেন, উনি এর মধ্যে কি বলবেন?

কতকগুলো ছেলেছোকরা সমস্বরে কি একটা কথা বলতে গেল—আমি ওদের থামিয়ে দিয়ে মামাশ্বশুরকে বললুম—আপনি গহনা এখন চান কেন?

মামাশ্বশুর বল্লে—গহনা বৌমার গা থেকে হারিয়ে যেতে পারে, এমন গোলমাল আর ভিড়ের মধ্যে। আমাদের কাছে এখন রেখে দিই, এর পরে আবার দেবো—

বললুম—না, গহনা আমরা দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর মহা রুখে উঠলো।

—দিতে পারেন না? আপনি কে মশাই? আপনার কি অধিকার আছে দেবার না- দেবার? আমার বৌমার গহনা আমি নিতে এসেচি, আপনি যে বড়—

পেছন থেকে একজন ছোকরা বললে—ওঃ ভারী বৌমা এখন, বড় দরদ দেখাতে এসেচেন বৌমার ওপর— এতদিন কোথায় ছিলেন মশাই? কেশবের অসুখের সময় কোনদিন তো চুলের টিকিও দেখি নি—

মামাশ্বশুর বললে—মুখ সামলে কথা কও বলচি—

পেছনের সেই চোয়াড় লোকটা আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসে বললে—আলবৎ আমরা গহনা নিয়ে যাবো—আমাদের বৌয়ের গহনা আমরা নিয়ে যাবো তাতে কে কি করবে?

একটা হৈ হৈ বাধবার উপক্রম হয়ে উঠলো, মামাশ্বশুরের ও তার সঙ্গীর এই কথায় আমি আমাদের দলের ছোকরাদের থামিয়ে দিয়ে বললুম—আপনাদের গহনা আপনারা নিয়ে যাবেন কি না সে তর্ক

আমরা করতে আসি নি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনাদের ঘরেরই তো বৌ, ছেলেমানুষ, কাঁদচে, এই কি সময় ওর গা থেকে গহনা খুলে নেবার? এখন আমরা তা হতে দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর বল্লে—হতে দিতে পারেন না কি মশাই? আপনি যে বড্ড লম্বা লম্বা কথা বলচেন দেখতে পাই। হতে দিতে হবে—আমরা গহনা নিয়ে যাবোই, আপনি কি করবেন?

আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল লোকটার ইতরামি দেখে। বললুম—আপনারা বলচেন আপনাদের বৌমা, এই বুঝি তার ওপর আপনাদের দরদের পরিচয়? গহনা নিতে এসেচেন এ সময় গা থেকে খুলে? গহনা যদি আমরা না দিই, কি করবেন আপনারা?

ওরা তিনজনেই আস্ফালন করে বলে উঠলো—গহনা জোর করে নিয়ে যাবো, আপনাদের কি অধিকার আছে গহনা আটকাবার? কে আপনারা? আলবৎ গহনা আমরা নিয়ে যাবো—

এইবার আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে উঠলো—তারা সবাই রাণীকে ঘিরে দাঁড়িয়েচে ততক্ষণ। তারা বললে—কারো সাধ্যি নেই, আমরা এখানে থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়ের গা থেকে গহনা ছিনিয়ে খুলে নিয়ে যায়—আসুক কে এগিয়ে আসবে দেখি—

একটা তুমুল হৈ চৈ ও বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি হোল তারপরে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে লাগলো—লোক জমে গেল চারিধারে—সকলেই জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা কি? ওরাও চীৎকার করে —

—দেখে নেবো, কার সাধ্যি—

—কি হয়েচে মশাই? ব্যাপারটা কি মশাই?

—আলবৎ নিয়ে যাবো,—কত জোর গায়ে আছে দেখবে?

—হাঁ হাঁ মশাই, থামুন,—থামুন—

—ভদ্রলোক না ছোটলোক—চামার একেবারে—

—মুখ সামলে—খবরদার—

—আমাদের বোনের মত—আমাদের গাঁয়ের মেয়ে—

—পুলিস পুলিস—

সবাই মিলে যখন একটা দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাত করে তুলেচে, তখন হঠাৎ আমার চোখ পড়লো রাণীর দিকে। সদ্য-বিধবা হতভাগিনী বালিকা ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠে বড় বড় ভীতিপূর্ণ চোখে যুধ্যমান দল দুটির দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে—একে তো সে অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কলকাতাতেই বিয়ের আগে কখনো আসেনি, তার উপর আজই সে বিধবা হয়েচে। এত বেলা হয়েচে এক বিন্দু জল নিশ্চয়ই ওর মুখে যায় নি, এদিকে দেওর আর মামাশ্বশুরের এই কাণ্ডকারখানা... একপাল পুরুষ-মানুষের মধ্যে আজকার দিনে ওই বালিকা একা, এমন আর একজন মেয়েমানুষ নেই যে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, একটা সহানুভূতির কথা বলে। ওর সেই ছবিটা আমার মনে এল, ওদের গাঁয়ের পুকুরঘাটে সেই যে ওকে দেখেছিলুম—সহজ, সরল, নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দে ভরপুর, লীলাময়ী, সুন্দরী কিশোরী। একটা সুকুমার সন্ধ্যামালতী ফুলের লতাকে ছায়াবৃক্ষের

শীতল আশ্রয় থেকে জোর করে ছিঁড়ে এনে কাশীমিত্রের ঘাটের চিতার আগুনের আঁচে বসানো হয়েচে —ওর চোখের জল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েচে সেই আঁচে...

পুলিসের কথা শুনে ভাইবোন দুজনেই ভয় পেয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের লোক, পুলিস সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বোন ভয়ে ভয়ে বললে—দাদা, তুমি ঝগড়া কোরো না ওদের সঙ্গে, গহনা আমি খুলে দিচ্চি, তুমি ওদের দ্যাও—এই ধরো—পুলিস আসবার আগেই দিয়ে দ্যাও দাদা—

দাদা আমায় বললে—দেখুন, আমি বলছি কুটুম্বের সঙ্গে একটা মনান্তর করে কি হবে, রাণীও বলচে গহনাগুলো না হয় দিয়েই—

বললুম—কক্ষনো না। তা হতে পারে না। পুলিস আনবে আনুক না? ওদের সে সাহস হোলে তো? তুমি ভয় খেও না।

ছেলেরাও বললে—রাণী, তুই কিছু ভয় খাসনে। আমরা আছি এখানে, কারো সাধ্য নেই কিছু করে। ওরা তিনজন আর আমরা এগারজন—

আমাদের দলের প্রতুল বলে যে ছোকরা আমার বাসায় আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে বললে, আচ্ছা দাঁড়ান আপনারা সবাই একটু—আমি রজনী ডাক্তারকে ডেকে আনি, তিনি নিকটেই থাকেন, প্রবীণ মানুষ, তিনি রাণীর বরের চিকিৎসা করেছিলেন এই অসুখে। তিনি যে রকম পরামর্শ দেন, তাই করা যাবে—কি বলেন?

মামাশ্বশুর আর তার সঙ্গী কি একটা পরামর্শ করলে নিজেদের মধ্যে। তারপর ওদের সঙ্গী সেই চোয়াড় লোকটা কোথায় চলে গেল।

আমাদের দলের একটা ছোকরা বল্লে—গেল কোথায়?

বললুম—যেখানে খুশি যাক গে। চিতার দিকে লক্ষ্য রেখো—রাণীকে বসতে বলো ওর দাদার কাছে গিয়ে। রোদে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

দেওর আর মামাশ্বশুর আমাদের থেকে একটু দূরে বসেছে। কি একটা পরামর্শ আঁটছে দুজনে, বেশ বুঝতে পারা গেল। রাণীর ভাই একবার ভয়ে ভয়ে বললে—থানায় যায় নি তো?

আমাদের দলের কেউ কেউ বললে—ওরা নইলে আরও লোক আনতে গিয়েচে। একটা মারামারি না করে দেখছি ছাড়বে না।

রাণীর দাদা বললে—সেটা কি ভাল হবে? তার চেয়ে দিই না গহনা ওদের হাতে? আমি বুঝিয়ে বল্লুম—কেন তুমি গহনা দিতে যাবে? এ গহনা ওরা দেয় নি, দিয়েছেন তোমার বাবা। ওদের কোন অধিকার নেই এতে। রাণীর শ্বশুরবাড়ীর যেমন গতিক দেখচি, তাতে মনে হয়, সেখানে ওর স্থান হবে না। ওই গহনাগুলোই ওর সম্বল। গহনার মধ্যে তো দেখছি একছড়া হার, আর হাতের চুড়ি কগাছা, আর তো কিছু নেই। তাই বা কেন হাতছাড়া করবে? গুণ্ডা আনে, আমরাও পুলিসে খবর দিতে পারি।

ওদের ফিরতে দেরি দেখে ভেবেছিলুম ব্যাপারটা আর বোধ হয় গড়ালো না; কিন্তু রাণীর অদৃষ্টে সেদিন আরও দুঃখ ছিল। একটু পরে সত্যিই ওরা একদল লোক নিয়ে ফিরে এল। আমাদের দেখিয়ে

বললে—এরা কোথা থেকে এসেছে চিনি নে। উনি আমার বৌদিদি, মা আসতেন শ্মশানে, কিন্তু তিনি বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না। বৌদিদির ভাইয়ের মতলব গহনাগুলো হাতিয়ে নেওয়া, তাই বোধ হয় এই সব বন্ধুর দল এসেছে।

আবার একটা গোলমাল, তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি শুরু হোল। তখন গোলমাল শুনে পুলিস এসে না পড়লে হাতাহাতি পর্যন্ত হতে বাকী থাকত না। আমাদের দুই দলকেই থানায় যেতে হবে বললে।

ইতিমধ্যে দাহকার্য শেষ হয়ে গিয়েছিল—আমরা রাণীকে স্নান করিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক আটকে থাকতে হোল। নানারকম জেরা জবানবন্দি চললো আমাদের উপর। রাণী তো ভয়েই সারা। সে ভাবলে গহনাগুলো খুলে না দেওয়ার অপরাধে পুলিসে এখুনি তাকে হাজতে আটকে রাখবে। অপর পক্ষের লোকেরা নিজেদের সাচ্চা প্রতিপন্ন করতে আমাদের ঘাড়ে নানারকম দোষ চাপালে, এমন কি রাণীর সম্বন্ধেও দু'একটা এমন কথা বল্লে, যা থানার বাইরে বল্লে আমাদের দলের ছোকরারা ওদের হাড় গুঁড়িয়ে দিত।

বেলা তিনটার সময় থানা থেকে আমাদের ছুটি হোল।

রাণীকে এখন কোথায় পাঠান যায়? .....

এর শ্বশুরবাড়িতে ওকে নিয়ে তোলা আমাদের কেউ সমীচীন মনে করলে না—বিশেষ করে এইমাত্র যখন তার দেওরের সঙ্গে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

আমরা ওর ভাইকে পরামর্শ দিলাম, ওকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে, নইলে একা শ্বশুরবাড়ীতে ওকে রেখে গেলে দেওর আর শাশুড়ীতে মিলে ওর যা দুর্দশা করবে, সে কল্পনা না করাই ভাল। ভাইয়ের কাছে আবার দু'জনের যাওয়ার মত ভাড়া নেই। আমাদের যার কাছে যা ছিল দিয়ে দু'জনের দু'খানা টিকিট কিনে ওদের শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে এলাম।

শুনলুম ও বিয়ের পর জোড়ে একবার বাপের বাড়ী গিয়েছিল বরের সঙ্গে নববধূর সাজে, সেই যে এসেছিল, আর এই যাচ্ছে।

সেই কথা মনে হওয়ার দরুন বা অন্য কিছু জানিনে, যাবার সময় রাণী খুব কাঁদতে লাগলো। এতক্ষণ ও তেমন কাঁদে নি। সারাদিনে যে ঝড় ঐ মেয়েটির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তারপরে ও যেন একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইচে।

ওর সে কান্না শুনলে বড় কষ্ট হয়। ছেলেমানুষের মত কান্না.....চীনে মাটির সাধের পুতুলটা ভেঙ্গে গেলে ছোট মেয়ে যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি.....স্বামীহীনা সদ্য-বিধবার কান্নার মত নয়, কান্নাটা.....মনে হয় ছেলেমানুষই তো, খেলার ঘরের পুতুল-ভাঙার কান্নাটাই শিখে রেখেচে, বড় মেয়ের মত ট্র্যাজিক কান্না কাঁদতে শেখে নি এখনও।

এর পরে রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বা তার খোঁজও রাখিনি। যদি বেঁচে থাকে, তার বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ বাপের বাড়ীতে ভাইয়ের স্ত্রীর দাসীবৃত্তি করে দুমুষ্টি অন্নসংস্থান করচে, অকালে বুড়ী হয়ে গিয়েচে, হয়তো বা এতদিন শুচিবাই রোগেও ধরেচে। ঐ ছাড়া আর তার কি হবে?

কিন্তু ওর সেই ছেলেবেলাকার পুকুরঘাটের সেই কুমারী দিনের ছবিটি আমার চিরকাল মনে রয়ে গেল.....পুকুরের বাঁধা ঘাটে নামচে.....দু' আঙুলে ধরে রাঙা গামছাখানা খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্চে লীলাময়ী বালিকা..... সেই ছবিটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারিনে।

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভটচাজের বাড়ী দু'দিন হাঁড়ি চড়ে নি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ী ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়ীতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ী থেকে যে ক'টি ধান এনেছিল তা ফুরিয়ে গিয়েচে। —ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। ক'দিন থেকে পেট ভরে না-খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

নেপাল বললে, "এই গোপলা, ক্ষিদে পেয়েচে না তোর?"

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, "হুঁ, দাদা!"

"মাকে গিয়ে বল; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।"

"মা বকে; তুমি যাও দাদা!"

"বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?"

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুয্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, "ও চুনি, শুনে যা!"

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "কি?"

"আয় না ভেতরে।"

"না যাবো না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসীমাদের বাড়ী যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েছে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।"

"কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?"

"ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ী লোকজন খাবে।"

"সত্যি?"

"তা জানিস নে বুঝি? আমাদের বাড়ীর সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।"

"আমাদেরও করবে?"

"সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?"

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে, "আজ কি বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুক্কুরবার বোধ হয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।"

গোপাল বললে, "কি মজা! না দাদা?"

"চুপ করে থাক,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস?"

গোপাল সেটা জানতো না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশী হয়ে উঠলো। সত্যিই তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কি বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ী যাবার পথে পড়ে জটি পিসীমার বাড়ী। নেপাল বললে, "তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ী ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ী তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।"

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদীঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসীমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী; গ্রামসুদ্ধু ছেলে-মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসীমা।

পিসীমা বললেন, "কি রে?"

"তাল নেবে পিসীমা?"

"হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।"

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসীমা বললেন, "পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধ্যেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?"

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, "মাছ ধরতে।"

"পেলি?"

"ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোট বেলে....তাহ'লে যাই পিসীমা?"

"আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল? অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।"

জটি পিসীমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দু'জনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসীমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস করলে, "তাল নেবেন তা হ'লে?"

"তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। ক'টা করে পয়সায়?"

"দুটো করে দিচ্ছি পিসীমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।"

"বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।"

"মিশকালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।"

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, "কবে তাল দিবি দাদা?"

''কাল।''

''তুই ওদের কাছে পয়সা নিস নে দাদা।''

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, ''কেন রে?''

''তাহ'লে আমাদের নেমতন্ন করবে, দেখিস এখন।''

''দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়বো—আর পয়সা নেবো না?''

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পূবদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট খট শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবচে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনো করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠে নি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদীঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, ''কি খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?''

''তাল কুড়ুতে দীঘির পাড়ে।''

''বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর! বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।''

গোপাল ভয়ে ভয়ে দীঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগলো। বড় আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসীমার বাড়ী হাজির।

জটি পিসীমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন, ''কিরে খোকা?''

গোপাল একগাল হেসে বললে, ''তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসীমা!''

জটি পিসীমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধূলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশ ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবায় কটকটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস করলে, ''ব্যাঙগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?''

গোপালের মা বলেন, ''নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।''

''আজ কি বার, মা?''

''সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কি দরকার?''

''মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?''

"তা হয়তো হবে। কি জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কি দরকার আমার?"

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, "জটি পিসীমার বাড়ীতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসী বললেন, 'তাল গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয় নি।' —কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হ'লে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!"

"ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!"

"সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। এই একটা বোকা!"

"আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না?"

'হুঁ।"

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ীর পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; জানালা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হ'লে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!...

জটি পিসীমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, "খোকা, কাঁকুড়ের ডালনা আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।" জটি পিসীমার বড় মেয়ে লাবণ্য-দি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে, "খোকা, ক'খানা নিবি তিল-পিটুলি?"—বলেই লাবণ্য-দি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসীমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন, "খোকা যাই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হ'ল!... খা, খা,—খুব খা—আজ যে তালনবমী রে!" ...কত কি চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারি গন্ধ—বাতাসে! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে!.....সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে.....লাবণ্য-দি হেসে হেসে বলছে, "আর নিবি তিল-পিটুলি?"

"ও গোপাল?"

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানালার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা... সে শুয়ে আছে তাদের বাড়ীতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, "ওঠ, ওঠ, বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আজি কি বার মা....?"

"মঙ্গলবার।"

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুরে মধ্যে ওসব কি হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়লো, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইলো। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-

জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা সিরসির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইলো বটে, কিন্তু কই, পিসীমাদের বাড়ী থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এলো না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড় ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন.....

গোপাল ভাবলে এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভটচাজ ও তার ছোট ভাই দীনু সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভটচাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, "এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?"

গোপাল বললে, "কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"জটি পিসীমাদের বাড়ী তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করে নি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কি না, সবাইকে তো বলেনি....."

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশাহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাবো....."

রাগ করবার মত কি কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে, "বা রে! তা অত রাগ করিস কেন? কি হয়েচে?"

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়লো—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল? তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুটকে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ীর সামনে দিয়ে জটি পিসীমাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল....

আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

আইনস্টাইন কেন যে দার্জিলিং যাইতে যাইতে রানাঘাট নামিয়াছিলেন বা সেখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে "On....ইত্যাদি ইত্যাদি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন—একথা বলিতে পারিব না। আমি ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমি আপনাদের নিকট সরবরাহ করিতে অপারগ, তবে আমি যেরূপ অপরের নিকট হইতে শুনিয়াছি সেরূপ বলিতে পারি।

আসল কথা, নাৎসী জার্মানী হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর হইতে বোধহয় আইনস্টাইনের কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, বক্তৃতা দিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে আগমন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেনও একথা সকলেই জানেন, আমি নূতন করিয়া তাহা বলিব না।

কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গণিতের অধ্যাপক রায়বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেনেট হলে আইনস্টাইনের অদ্ভুত বক্তৃতা "On the Unity & Universality of Forces" শুনিয়া অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মত তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে আইনস্টাইনকে আনাইয়া একদিন বক্তৃতা দেওয়াইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"না রায় বাহাদুর, আমার অন্য কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এমন দিনে একজন জার্মান—"

রায় বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন (যেমন ধরনের উত্তেজিত হইয়া তিনি উঠিতেন সন্ধ্যায় রামমোহন উকিলের বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের সময়, অন্য কেহ যদি কোন বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিত)—"সে কি মহাশয়! জার্মান কি? জার্মান? আইনস্টাইন জার্মান? ওঁদের মত মহামানবের, ওঁদের মত ঋষি বৈজ্ঞানিকের দেশ আছে? জাতের গণ্ডি আছে? আমি বলি—"

প্রিন্সিপাল বলিলেন—"আমিও বলছি নে যে তা আছে। কিন্তু বর্তমানে যেমন অবস্থা—" দুই প্রবীণ অধ্যাপকে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত, তিনি মধ্যযুগের স্কটলাস্টিক দর্শনের প্রধান আচার্য জন স্কোটাসের উদাহরণ দেখাইলেন। আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও নবম শতাব্দীর গোঁড়াদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ফ্রান্সে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আয়র্লণ্ডে আর ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি? আসল মানুষটাকে কে দেখে ! তাঁর মতামতেরই মূল্য দেয় লোকে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত যখন প্রিন্সিপাল রাজি হইলেন না তখন রায় বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার কানে গেল আইনস্টাইন শীঘ্রই দার্জিলিং যাইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া

অবধি নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হিমালয় দেখিতে পারে নাই, এইবার এত কাছে আসিয়া আর দার্জিলিং না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

রায় বাহাদুর ভাবিলেন দার্জিলিঙের পথে রানাঘাটে নামাইয়া লইয়া সেখানে এক সভায় আইনস্টাইনকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে কেমন হয়?

রায় বাহাদুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করিলেন।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ভারতবর্ষের দর্শনের কথা আমায় কিছু বলুন।"

রায় বাহাদুর প্রমাদ গনিলেন। তিনি গণিতের অধ্যাপক; দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শনের কোন খবর রাখেন না, তবুও ভাগ্যে গীতা মাঝে মাঝে পড়া অভ্যাস ছিল; সুতরাং অকূল সমুদ্রে গীতারূপ ভেলা (কোন আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) অবলম্বন করিয়া দু-এক কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। 'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ম্যাক্সমূলারের বেদান্তদর্শনের উপর প্রবন্ধ পড়ে এক সময়ে সংস্কৃত শেখবার বড় ইচ্ছে হয়। দর্শনে আমি স্পিনোজার মানসশিষ্য। স্পিনোজার দর্শন গণিতের ফর্মে ক্রমানুসারে সাজানো। স্পিনোজার মন গণিতজ্ঞ স্রষ্টার মন, সেজন্য আমি ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু বেদান্ত সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন এক রাজ্যের সন্ধান পেলাম। ইউক্লিডের মত খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক মন স্পিনোজার, সেখানে কূটতর্কও বাঁধা পথে চলে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনাবিলাসী—।"

রায় বাহাদুর অবাক হইয়া আইনস্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি!

আইনস্টাইন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের একত্র মিলনকে আপনি কল্পনার ছাঁচে ঢালাই-করা বিবেচনা করেন না নাকি?"

রায় বাহাদুর আরও অবাক। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "নতুন ডাইমেনশানের সন্ধানদাতা আপনি, নিউটনের পর নববিশ্বের আবিষ্কারক আপনি—আপনাকে কল্পনাবিলাসী বলতে—"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর কবিসুলভ দীর্ঘ কেশ ও স্বপ্নভরা অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কল্পনা প্রখর না হইলে হয়তো বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, রায় বাহাদুর ভাবিলেন। কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, আইনস্টাইন পাশের ছোট টেবিল হইতে চুরুটের বাক্স আনিয়া রায় বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিজের হাতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিয়া ছুরি দিয়া ডগা কাটিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিলেন। রায় বাহাদুরের বাঙালী মন সংকুচিত হইয়া উঠিল। অত বড় বৈজ্ঞানিকের সামনে সিগার ধরাইবেন তিনি, জনৈক হেঁজিপেঁজি অঙ্কের মাস্টার? তাছাড়া সাহেবও তো বটে, সেটাও দেখিতে হইবে তো। সাহেব জাত কাঁচাখেগো দেবতার জাত। রায় বাহাদুর একটা সিগার তুলিয়া বলিলেন—"আপনি?"

—"ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি নে।"

—"ও!"

—"আমি একটা কথা ভাবছি।"

—"কি, বলুন।—"

—"রানাঘাটে সভা করলে কেমন লোক হবে আপনার মনে হয়? কেমন জায়গা রানাঘাটে?"

—"জায়গা ভালই। লোকও হবে।"

—"কিছু টাকা এখন দরকার। যা ছিল জার্মানিতে রেখে এসেছি। ব্যাঙ্কের টাকা এক মার্কও তুলতে দিলে না, একরকম সর্বস্বান্ত।"

—"আমি রানাঘাটে বিশেষ চেষ্টা করছি, সার।"

—"ওখানে বড় হল পাওয়া যাবে কি?"

—"তেমন নেই। তবে মিউনিসিপ্যাল হল আছে, মন্দ নয়, কাজ চলে যাবে।" রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলেন, ভাবিলেন এত বড় লোকের সময়ের ওপর অত্যাচার করিবার দরকার নাই।

আইনস্টাইন বলিলেন—"আমার কিছু ছাপা কাগজ ও বিজ্ঞাপন নিয়ে যান। যে বিষয়ে বক্তৃতা হবে, সে আপনাকে পরে জানাব, টিকিটের দাম কত করব?"

—"খুব বেশি নয়—এই ধরুন—"

—"তিন মার্ক—দশ শিলিং?"

—"আজ্ঞে না সার। সর্বনাশ! এ সব গরিব দেশ। দশ শিলিং আজকাল দশ টাকার কাছাকাছি পড়বে। ও-দামে টিকিট কেনবার লোক নেই এদেশে, সার।"

—"পাঁচ শিলিং?"

—"আচ্ছা, তাই করুন। ছাত্রদের জন্য এক শিলিং।"

আইনস্টাইন হাসিয়া বলিলেন, "ইউনিভার্সিটির টিকিট কিনতে হবে না। আমি নিজেও স্কুল-মাস্টার। আমার ওপর তাদের দাবি আছে। বম্বে ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও তাই হয়েছিল। ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। এই নিয়ে যান ছাপা হ্যাণ্ডবিল ও কাগজপত্র—"

রায় বাহাদুর বিল হাতে পাইয়া পড়িয়া দেখিতে গিয়া বিষণ্ণমুখে বলিলেন—"এ কি সার? এ যে ফরাসী ভাষায় লেখা!"

—"ফরাসী ভাষায় তো বটেই। প্যারিসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছাপিয়েছিলাম। কেন, ফরাসী ভাষা বুঝবে না কেউ? আমি তো সেদিন শুনলাম এখানে ইউনিভার্সিটিতে ফরাসী পড়ানো হয়?"

—"আজ্ঞে না। সে হয়তো এক-আধজন বুঝতে পারে। সেভাবে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয় না। এখানে ইংরিজিটাই চলে। কেউ বুঝবে না সার।"

—"তাই তো! আপনি ইংরিজিতে অনুবাদ করে নিয়ে ওখানে কোনও প্রেসে ছাপিয়ে নেবেন দয়া করে?"

"—তা—ইয়ে—তা—আচ্ছা সার।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন—এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে বিনোদের শরণাপন্ন হইগে। ছোকরা ভাল ফ্রেঞ্চ জানে। কাঁহাতক আর একজন এত বড় লোকের সামনে 'জানি নে মশাই' বলা

যায়!

বিনোদ চৌধুরী তাঁর বড় শালা। পণ্ডিত লোক। অনেক রকম ভাষা তার জানা আছে। সে উৎসাহের সঙ্গে বিলগুলির বাংলা ও ইংরিজি অনুবাদ করিয়া দিয়া বলিল, —"আমি চাটুয্যে মশায়, রানাঘাট যাব সেদিন। আমার থিওরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচয় অবিশ্যি লিন্ডেন বুলটনের পপুলার বই থেকে। তবুও আইনস্টাইনকে আমি এ যুগের ঋষি বলে মানি। সত্যকার দ্রষ্টা ঋষি। সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেন, তাঁরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। লম্বা লম্বা মার্কা ইকোয়েশন বুঝতে না পারি, কষতে না পারি, কিন্তু কে কি দরের সেটুকু—।"

রায় বাহাদুর দেখিলেন চতুর শ্যালকটি তাঁহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"অর্থাৎ সেই সঙ্গে আমার দরটাও বুঝি ঠিক করে ফেললে বিনোদবাবু? বেশ, বেশ।"

—"রামোঃ! চাটুয্যে মশায়, ছি ছি, তেমন কথা কি আমি বলি?"

—"বল না?"

—"স্পেস—টাইম—কনটিনিউয়ামের মোহজালে পড়ে কোনটা কখন কি অবস্থায় বলেছি, তা কি সব সময় হলফ নিয়ে বলা যায় চাটুজ্যে মশায়? এবেলা এখানে থেকে যাবেন না?"

—"না না, আমার থাকবার জো নেই। অনেক কাজ বাকি। যাতে দুপয়সা হয় ভদ্রলোকের, সে ভার আমার ওপর। দেখি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদের একটু ধরাধরি করিগে। ঘুঘু সব। হলটা যদি পাওয়া যা—"

—"কি বলেন আপনি চাটুয্যে মশায়! আইনস্টাইনের নাম শুনলে হল না দিয়ে কেউ পারবে? আহা, শুনলেও কষ্ট হয়, অত বড় বৈজ্ঞানিককে আজ এ বৃদ্ধ বয়সে পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে—দি ওয়ার্লড ডাজ নট নো ইটস গ্রেটেস্ট—"

—"তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিনোদ। ঐ যা শেষকালে বললে ঐ কথাটাই ঠিক। অনেক ধরাধরি করতে হবে। পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনেই যাই।"

ইহার পরের কয়েকদিন রায় বাহাদুর অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন। রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাস্টার, উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসাদারগণের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য রাখিলেন, সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ, সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ। যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চলিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তার অভয়বাবু বলিলেন,—"কি নামটি বললে মশাই সাহেবের? আ—কি? আ—ইন স্টাই—ন? বেশ বেশ। হাঁ, বিখ্যাত নাম। সবাই জানে সবাই চেনে। ওঁরা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ—নাম শোনা আছে বইকি।"

রায় বাহাদুর রাগে ফুলিয়া মনে মনে বলিলেন— তোমার মুণ্ডু শোনা আছে, ড্যাম ওল্ড ইডিয়ট! এ তুমি কাপুড়ে মহাজন শ্যামচাঁদ পালকে পেয়েছ? স্বনামধন্য! তিন জন্ম কেটে গেলে যদি এ নাম তোর

কানে পৌঁছয়। মিথ্যে সাক্ষী শিখিয়ে তো জন্ম খতম করলি, এখন আইনস্টাইনকে বলতে এসেছে স্বনামধন্য পুরুষ! ইডিয়সির একটা সীমা থাকা চাই।

নির্দিষ্ট দিনে রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে লইয়া সকালের ট্রেনে রানাঘাটে নামিলেন। তাঁর শালা বিনোদ চৌধুরী দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, বিশেষ কার্যবশত তাহার আসা সম্ভব হইল না, আইনস্টাইনের বক্তৃতা শোনা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, ইত্যাদি। সেজন্য রায় বাহাদুরের মনে দুঃখ ছিল, ছোকরা সত্যিকার পণ্ডিত লোক, আজকার এমন সভায় বেচারীর আসিবার সুযোগ মিলিল না। ভাগ্যই বটে।

রানাঘাট স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সম্মুখের প্রাচীরে নজর পড়িতে রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। একি ব্যাপার! প্রাচীরের গায়ে লটকানো ঢাউস এক দু-তিন-রঙা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছে—

বাণী সিনেমা গৃহে (নীল)

আসিতেছেন! আসিতেছেন!! (কালো)

আসিতেছেন!!! (কালো)

কে?? (কালো)

কবে?? (কালো)

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী (লাল)

অদ্য রবিবার ২৭শে কার্তিক সন্ধ্যা ৫।।০ টায় (নীল)

জনসাধারণকে অভিবাদন করিবেন!! (কালো)

প্রবেশমূল্য ৫, ৩, ২ ও ১ টাকা (কালো)

মহিলাদের ৫ ও ২ টাকা (কালো)

এমন সুযোগ কেহ হেলায় হারাইবেন না। (লাল)

কি সর্বনাশ!

রায় বাহাদুর রুমাল বাহির করিয়া কার্তিক মাসের শেষের দিকের সকালেও কপালের ঘাম মুছিলেন। তাহার পর একবার ভাল করিয়া পড়িলেন তারিখটা। না, আজই। আজ রবিবার ২৭শে কার্তিক।

অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন আর একখানা সেই বিজ্ঞাপন। ক্রমে যতই যান, সর্বত্রই সেই তিনরঙা বিজ্ঞাপন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত যাইতে অন্তত ছত্রিশখানা সেই বিজ্ঞাপন আঁটা দেখিলেন বিভিন্ন স্থানে।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু ফুলবাগানের সামনে ছোট বারান্দায় বসিয়া তেল-ধুতি পরনে তেল মাখিতেছিলেন। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন! হাসিয়া বলিলেন—"খুব সৌভাগ্য দেখছি। এত সকালে যে? —নমস্কার!"

—"নমস্কার, নমস্কার! চানের জন্যে তৈরী হচ্ছেন? ছুটির দিনে এত সকাল যে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, চানটা সকালেই করি।"

—"বাড়ীতে?"

—"আজ্ঞে না, চূর্ণীতে যাই। ডুব দিয়ে চান না করলে—অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকেই। বসুন, বসুন। আজ যখন এসেছেন তখন দুপুরের গরিবের বাড়ীতেই দুটো ডাল-ভাত—"

—"সেজন্যে কিছু না। নো ফরম্যালিটি। আমার মাসতুতো ভাই নীরেনের ওখানে না গেলে রাগ করবে। সেবার তো যাওয়াই হোল না।"

—"তাহলে চা চলবে তো?"

—"তাতে আপত্তি নেই। সে হবে এখন। আসল যে জন্যে আসা—তা এ এক কি হাঙ্গামা দেখছি? কে ইন্দুবালা দেবী আসছে বাণী সিনেমাতে আজই—"

—"হ্যাঁ তাই তো, দেখছিলাম বটে।"

—"দিন বুঝি আজই?"

—"তাই তো—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক্ল্যাশ করবে কিনা?"

—"এখন তো আমরা দিন বদলাতে পারি না। সব ঠিকঠাক। আমাদেরও হ্যাণ্ডবিল বিলি, বিজ্ঞাপন বিলি, সব হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন আসবেন এই দার্জিলিং মেলে।"

—"আমিও তো ভেবেছি। তাই তো—"

—"তবে আমার কি মনে হয় জানেন? যারা সিনেমাতে ইন্দুবালাকে দেখতে যাবে, তারা সাহেবদের লেকচার শুনতে আসবে না। সাহেবদের সভায় যারা আসবে, তারা ঠিকই আসবে।"

আইনস্টাইনকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করাতে রায় বাহাদুর মনে মনে চটিয়া গেলেন। এমন জায়গাতেও তিনি আনিতে চলিয়াছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে! এ কি পাটকলের ম্যানেজার, না রেলের টি. আই., যে 'সাহেব' 'সাহেব' করবি? বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয় তো!

মুখে বলিলেন,—"হাঁ, তা বটে।"

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু তাঁর অমায়িক আতিথেয়তার জন্যে রানাঘাটে প্রসিদ্ধ। চা আসিল, সঙ্গে এক রেকাবি খাবার আসিল। রায় বাহাদুর চা-পানান্তে আরও নানা স্থানে ঘুরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, অনেক কিছু ঠিক করিতে হইবে!

যাইবার সময় বলিলেন—"মিউনিসিপ্যাল হলের চাবিটা—"

শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আমাদের হলের চাকর রাজনিধিকো এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বাসার চাকরও যাবে। ওরা হল খুলে সব ঠিক করবে। সেখানে ফ্রী রীডিং রুম আছে, সকালে আজ ছুটির দিন খবরের কাগজ পড়তে লোকজন আসবে। তাদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা তাদের ধরে বেঞ্চি সাজিয়ে নিচ্ছি। কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু স্নান করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই তাঁহার বড় মেয়ে (শ্রীগোপালবাবু আজ তিন বৎসর বিপত্নীক, বড় মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, সে-ই সংসার দেখাশুনা করে) বলিল, —"বাবা, আমাদের পাঁচখানা টিকিট করে এনে দাও।"

—"কিসের টিকিট?"

—"বা রে, বাণী সিনেমায় ওবেলা ইন্দুবালা আসছে—নাচগান হবে। সবাই যাচ্ছে আমাদের পাড়ার।"

—"কে যাচ্ছে?"

—"সবাই! এই মাত্তর রাণু, অলকা, টেঁপি, যতীন কাকার মেয়ে ঢেঁড়স—এরা এসেছিল। ওরা সব বক্স নিচ্ছে একসঙ্গে—বক্স নিলে মেয়েদের আড়াই টাকা করে রিজার্ভ টিকিট দিচ্ছে। আমাদের জন্যে একটা বক্স নাও।"

শ্রীগোপালবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন,—"হ্যাঁ ভারি—আবার একটা বক্স! বড্ড টাকা দেখেছিস আমার। সেই ১৯০৩ সাল থেকে জোয়াল কাঁধে নিয়েছি, সে জোয়াল আর নামল না। কেবল টাকা দাও আর টাকা দাও—"

অপ্রসন্ন মুখে দেরাজ খুলিয়া মেয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশী রাধাচরণ নাগ আসিয়া বৈঠকখানায় উঁকি মারিয়া বলিলেন—"কি হচ্ছে শ্রীগোপালবাবু?"

—"আসুন ডাক্তারবাবু, খবর কি? যাচ্ছেন তো ও বেলা?"

—"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারা যাচ্ছেন তো?"

—"যাব বই কি। রানাঘাটের ভাগ্য অমন কখনও হয়নি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। টাকা-খরচ—ও তো আছেই। কিন্তু এমন সুযোগ—বাড়ীর সবাই ধরেছে, দিলাম দশটা টাকা বের করে। বলি বয়েস তো হোল ছাপ্পান্নর কাছাকাছি, কোনদিন চোখ বুজব, তার আগে—"

—"নিশ্চয়। জীবনে ওসব শোনবার সৌভাগ্য কবার ঘটে? আমাদের রানাঘাটবাসীর বড় সৌভাগ্য যে উনি আজ এখানে আসবেন।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। বয়েস হয়ে এল, দেখে নিই, শুনে নিই—গেলই না হয় গোটাকতক টাকা।"

—"তা ছাড়া, অত বড় বিখ্যাত একজন—"

—"সে আর বলতে! আজকাল সব জায়গার দেখুন ইন্দুবালা দেবী, সাবানের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, গন্ধতেলের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, শাড়ির বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালার ছবি! তাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য—বিশেষ করে রানাঘাটের মত এঁদোপড়া জায়গায়—সৌভাগ্য নয়? নিশ্চয় সৌভাগ্য!"

শ্রীগোপালবাবু হাঁ করিয়া নাগ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ঝাড়া মিনিট-দুই পরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি কিন্তু সে কথা বলছি নে। আমি বলছি সায়েবের লেকচারের কথা, মিউনিসিপ্যাল হলে।"

রাধাচরণবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন,—"কোন সায়েব?"

—"কেন, আপনি জানেন না? আইনস্টাইন—মিঃ আইনস্টাইন !"

রাধাচরণবাবু উদাসীন সুরে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"ও, সেই জার্মান না ইটালিয়ান সায়েব? হ্যাঁ—শুনেছি, আমার জামাই বলছিল। কি বিষয়ে যেন লেকচার দেবে? তা ওসব আর আমাদের এ বয়সে—লেখাপড়ার বালাই অনেকদিন ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওসব করুকগে কলেজের ইস্কুলের ছেলে-ছোকরারা—হ্যাঁঃ!"

শ্রীগোপালবাবু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাধাচরণবাবু পুনরায় বলিলেন, —"তা আপনি কি করবেন শুনি?"

—"আমার বাড়ীর মেয়েরা তো যাচ্ছে সিনেমায়। তবে আমাকে যেতেই হবে সায়েবের বক্তৃতায়। রায় বাহাদুর নীলাম্বরবাবু এসে খুব ধরাধরি করছেন—"

—"কে রায় বাহাদুর? নীলাম্বরবাবুটি কে?"

"কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোাফেসার। তাঁরই উদ্যোগে সব হচ্ছে। তিনি এসে বিশেষ—"

রাধাচরণবাবু চোখ মিটকি মারিয়া বলিলেন,—"আরে ভায়া, একটা কথা বলি শোন। একটা দিন চল দেখে আসা যাক। ছবির ইন্দুবালা আর জ্যান্ত ইন্দুবালাতে অনেক ফারাক। ইহজীবনে একটা কাজ হয়ে যাবে। ওসব সায়েব-টায়েব ঢের দেখা হয়েছে। দুবেলা রানাঘাট ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাক দার্জিলিং মেল শিলং মেলের সময়ে—দেখ না কত সায়েব দেখবে। কিন্তু ভায়া এ সুযোগ—বুঝলে না?"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"তা—তা—কিন্তু, তবে রায় বাহাদুরকে কথা দেওয়া হয়েছে কিনা, তিনি কি মনে করবেন—"

রাধাচরণবাবু মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"হ্যাঁঃ! কথা দেওয়া হয়েছে রায় বাহাদুরকে! ভারি রায় বাহাদুর! এত কি ওবলিগেশন আছে রে বাবা। বলো এখন, বাড়ীর মেয়েরা সব গেল তাই আমায় যেতে হোল। তারা ধরে বসল তা এখন কি করা। বলি কথাটা তো নিতান্ত মিথ্যে কথাও নয়!"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—"তা—তা—তা তো বটেই। সে কথা তো—"

রাধাচরণবাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর এলে বলো এখন তাই। তাঁকেও অনুরোধ কর না বাণী সিনেমায় যেতে।"

—"চললেন?"

—"চলি। ওবেলা আসব ঠিক সময়ে।"

রায় বাহাদুর স্থানীয় জমিদার নীরেন চাটুয্যের বাড়ীতে বসিয়া সভা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আয়োজন করিতেছিলেন।

নীরেনবাবু রায় বাহাদুরের মাসতুত ভাই, স্থানীয় জমিদার ও উকিল। উকিল হিসাবে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু জমিদারির আয় ও পূর্বপুরুষসঞ্চিত অর্থে রানাঘাটের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। শিক্ষিত লোকও বটে।

রায় বাহাদুর গুরুভোজন করিয়া উঠিয়াছেন মধ্যাহ্নে। ধনী মাসতুতো ভাই-এর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন রীতিমত গুরুতর। দু-একবার নিদ্রাকর্ষণ হইতেও ছিল, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে শুইতে পারে নাই।

নীরেনবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, বক্তৃতায় মোট কথাটা কি হবে আজকের?"

—"তা ঠিক জানি নে। On the unity of forces—এই বিষয়বস্তু। এ থেকে ধরে নাও।"

—"উনি Space-এর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন, কি বলুন?"

—"অর্থাৎ?"

—"Space বলেছেন সীমাবদ্ধ। আগেকার মত অসীম অনন্ত space আর নেই।"

—"তোমার ম্যাথমেটিকস ছিল এম-এসসি-তে? Geometry of Hyperspaces পড়েছ?"

—"মিক্সড ম্যাথমেটিকস ছিল। আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি।"

—"খুব খুশি হলুম দেখে নীরেন যে শুধু জমিদারি কর না, জগতের বড় বড় বিষয়ে একটুআধটু সন্ধান রাখ। খুব বেশি সন্ধান হয়তো নয়, তবুও the very little that you know is unknown to many.''

—"আচ্ছা দাদা, উনি কি আজই চলে যাবেন?"

—"সম্ভব। দার্জিলিং যাবেন বলছিলেন। দার্জিলিঙের পথে এখানে নামবেন। যাতে ওঁর দুপয়সা হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

—"আজ সভার পরে আমার বাড়ীতে আসুন না একবার দাদা? এখানে রাতের জন্যে রাখতেও আমি পারি। আজ দার্জিলিঙের গাড়ী নেই। রাত্রে এখানে থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না।"

—"বেশ, বলব এখন।"

—"জাতে থাকেন তাই করুন। কালই খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট করিয়ে দেব এখন। ফ্রী প্রেসের আর আনন্দবাজারের রিপোর্টার এখানে আছে।"

রায় বাহাদুর বুঝিলেন তাঁর মাসতুতো ভাইটির দরদ কোথায়। সেসব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, এখন কোন রকমে কার্যসিদ্ধি হইলেই হয়। কোন রকমে আজ মিটিং চুকিলে বাঁচেন।

বাড়ীর ভিতর হইতে নীরেনবাবুর মেয়ে মীনা আসিয়া বলিল,—"ও জ্যাঠামশায়, বাবাকে বলে আমাদের টিকিটের টাকা দিন।"

নীরেনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন,—"যা যা বাড়ীর মধ্যে যা, এখন বিরক্ত করিসনি। ব্যস্ত আছি।"

মীনা আবদারের সুরে বলিল,—"তোমাকে তো বলিনি বাবা, জ্যাঠামশাইকে বলছি।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের টিকিট রে মীনু?"

মীনা বলিল,—"আপনি কোথায় থাকেন যে সর্বদা! আমাদের পাশের বাড়ীর সবিতা আপনাদের কলেজে পড়ে, সে বলে আপনি নাকি পথ চলতে চলতে অঙ্ক কষেন। সত্যি, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই?"

নীরেনবাবু পুনরায় ধমকের সুরে বলিলেন,—"আঃ, জ্যাঠা মেয়ে! যা এখান থেকে। জ্বালালে দেখছি। কিসের টিকিট জানেন দাদা, ঐ যে ইন্দুবালা নাকি আজ আসছে আমাদের এখানকার বাণী

সিনেমাতে, নাচগান হবে, কি নাকি বক্তৃতাও দেবে, তাই পাড়াসুদ্দু ভেঙেছে দেখবার জন্যে। মেয়েরা তো সকাল থেকে জ্বালালে।"

—"তা দাও না ওদের যেতে। আইনস্টাইনের লেকচারে আর ওরা কি যাবে। তবে দেখে রাখলে একটা বলতে পারত সারাজীবন। কি রে মীনু কোথায় যাবি?"

—"আমরা জ্যাঠামশাই সিনেমাতেই যাই। 'মিলন' ফিলমে ইন্দুবালাকে দেখে পর্যন্ত বড্ড একটা ইচ্ছে আছে ওকে দেখব। রানাঘাটে অমন লোক আসবে—"

রায় বাহাদুর বাকিটুকু যোগাইয়া বলিলেন,—"স্বপ্নের অগোচর! তাই না মীনু? টিকিটের দাম দিয়ে দাও মেয়েকে, ওহে নীরেন।"

মীনা এবার সাহস পাইয়া বলিল,—"আপনাকে আর বাবাকে যেতে হবে আমাদের নিয়ে। সে শুনছি নে। বাবার মনে মনে ইচ্ছে আছে জ্যাঠামশায়। শুধু আপনার ভয়ে—"

নীরেনবাবু তাড়া দিয়া বলিলেন,—"তবে রে দুষ্ট মেয়ে—"

মীনা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"বাবা, তোমাকে যেতেই হবে আমাদের নিয়ে। ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।"

দার্জিলিং মেলের সময় হইয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা।

রায় বাহাদুর ও কয়েকজন ছাত্র, নীরেনবাবু ও শ্রীগোপালবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—একি?

এত ভিড় কিসের? প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে এত ছোকরা ছাত্র, লোকজনের ভিড়! সত্যই কি আজ আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে এখানকার সকলের টনক নড়িয়াছে? ইহারা সকলেই দার্জিলিং মেলের সময় আসিয়াছে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে? অত বড় বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা বটে! লোকে লোকারণ্য প্ল্যাটফর্ম। হৈ হৈ কাণ্ড। রায় বাহাদুর পুলকিত হইলেন। সশব্দে মেলট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে ছোট একটি ব্যাগ হাতে দীর্ঘকেশ আয়তচক্ষু আইনস্টাইন অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা হইতে জনৈক সুন্দরী তরুণী, পরনে দামী ভয়েল গাড়ী, পায়ে জরিদার কাশ্মীরী স্যান্ডাল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তরুণীর সঙ্গে আরও দুটি তরুণী, দুটিই শ্যামাঙ্গী—দুজন চাকর, তারা লগেজ নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কে একজন বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে নেমেছেন! ঐ তো ইন্দুবালা দেবী—"

মুহূর্তমধ্যে প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ লোক সেদিকে ভাঙিয়া পড়িল। সেই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে রায় বাহাদুর অতিকষ্টে আইনস্টাইনকে লইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আইনস্টাইন অত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিলেন তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এত লোকের ভিড়। রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরা সবই কি স্থানীয় ইউনিভার্সিটির ছাত্র? এদের সঙ্গে

আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না মিঃ মুখার্জি?"

রায় বাহাদুর এই উদার সরলপ্রাণ বিজ্ঞানতপস্বীর ভ্রম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেন না।

রানাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি! হায় রে, এ দেশ কোন দেশ তা ইনি এখনও বুঝিতে পারেন না। সবই ইউরোপ নয়।

নীরেনবাবু চাহিয়া-চিন্তিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনী গোপাল পালেদের পুরানো ১৯১৭ সনের মডেলের গাড়ীখানি যোগাড় করিয়াছিলেন। তাহাতেই সকলে মিলিয়া চড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখা গেল তখনও বহুলোক স্টেশনের গেটের দিকে ছুটিতেছে। একজন কে বলিতেছিল,—"গাড়ী অনেকক্ষণ এসেছে, ঐ দেখ লেগে আছে প্ল্যাটফর্মে। শীগগির ছোট।" ভিড়ের মধ্যে কে উত্তর দিলে,—"এখান দিয়েই তো বেরুবেন, আর ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বড্ড ভিড়। ও তো চেনা মুখ। দেখলেই চেনা যাবে। কত ছবিতে দেখা আছে। সেদিনও 'মিলন' ফিলমে—"

আইনস্টাইন কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন,—"এরা ছুটছে স্টেশনে বুঝি? ওরা জানে না যাকে দেখতে চলেছে সে তাদের সামনেই গাড়ীতে উঠেছে। বেশ মজা, না? মিঃ মুখার্জি, এখানে ইউনিভার্সিটি কোন দিকে?"

সৌভাগ্যক্রমে ভিড়ের মধ্যের একটা লোক আইনস্টাইনের গাড়ীর সামনে আসিয়া চাপা পড়-পড় হওয়াতে হঠাৎ ফুটব্রেক কষার কর্কশ শব্দের ও 'এই এই' 'গেল গেল' রবের মধ্যে তাঁহার প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। স্টেশন ও ভিড় ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগোপালবাবু ও নীরেনবাবু নামিয়া গেলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন,—"এখুনি আসবেন তো?"

শ্রীগোপালবাবু কি বলিলেন ভাল বোঝা গেল না। নীরেনবাবু বলিলেন, "ওখানে ওদের পৌঁছে দিয়েই আসছি। আর কেউ বাড়ীতে লোক নেই মেয়েদের নিয়ে যেতে। টিকিটে এতগুলো টাকা যখন গিয়েছে—"

ঐ সামনেই মিউনিসিপ্যাল হল। স্টেশনের কাছেই। কিন্তু এ কি? সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল। পৌনে ছটা হইয়াছে, কেউ তো আসে নাই। জনপ্রাণী নয়। কেবল মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরাণী জীবন ভাদুড়ি একটা ছোট টেবিলে অনেকগুলি টিকিট সাজাইয়া শ্রোতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মোটর হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন রায় বাহাদুর। মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"হে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ, সুস্বাগতম। আমাদের রানাঘাটের মাটিতে আপনার পদার্পণের ইতিহাস সুবর্ণ অক্ষরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক—আমরা রানাঘাটাবাসীরা আজ ধন্য!"

চকিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ হলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লোক কই? রানাঘাটবাসীদের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ কোথায়?

আইনস্টাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে জনশূন্য হলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখনও আসেনি কেউ? সব স্টেশনে ভিড় করছে। মিঃ মুখার্জি, একটা ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে যে। বক্তৃতার সময় ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকবার দরকার হবে।"

আর ব্ল্যাকবোর্ড! রায় বাহাদুর স্থানীয় ব্যক্তি। নাড়ীজ্ঞান আছে এ জায়গার। তিনি শূন্য ও হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিতে লাগিলেন।

জীবন ভাদুড়ি কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—"মোটে তিন টাকার বিক্রি হয়েছে। তাও টাকা দেয়নি এখন। কি করব বলুন সার? আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে বলুন। আমার আবার বাসার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাণী সিনেমায় যেতে হবে। কলকাতা থেকে ইন্দুবালা এসেছেন—বাড়ীতে বড্ড ধরেছে সব। পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে মাইনে—তা বলি, থাক গে, কষ্ট তো আছেই। ওঁদের মত লোকে তো রোজ কলকাতা থেকে আসবেন না। যাক, পাঁচ টাকা খরচ হলে আর কি করছি বলুন। আমায় একটু ছুটি দিতে হবে সার। এ সায়েব কে? এ সায়েবের লেকচারে আজ লোক হবে না—কে আজ এখানে আসবে সার!"

জীবন ভাদুড়ি ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। হলের মধ্যে দেখা গেল চেয়ার বেঞ্চির জনহীন অরণ্যে মাত্র দুটি প্রাণী—আইনস্টাইন ও রায় বাহাদুর।

আইনস্টাইন ব্যাগ খুলিয়া কি জিনিসপত্র টেবিলের উপর সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সেগুলি তাঁহার বক্তৃতার সময় প্রয়োজন হইবে—সেই সুযোগে রায় বাহাদুর একবার বাহিরে গিয়া রাস্তায় এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

লোকজন যাইতেছে, ঘোড়ার গাড়ীতে মেয়েরা সাজগোজ করিয়া চলিয়াছে, দ্রুতপদে পথিকদল ছুটিয়াছে—সব বাণী সিনেমা লক্ষ্য করিয়া।

রায় বাহাদুরের একজন পরিচিত উকিলবাবু ছড়িহাতে দ্রুতপদে জনসাধারণের অনুসরণ করিতেছিলেন, রায় বাহাদুরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই যে! সায়েব এসেছেন? লোকজন কেমন হয়েছে ভেতরে? আজ আবার আনফরচুনেটলি ওটার সঙ্গে ক্ল্যাশ করল কিনা? অন্যদিন হলে —না, আমার জো নেই—বাড়ীর মেয়েরা সব গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে —কাজেই—"

রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সাড়ে ছটা। পৌনে সাতটা। সাতটা।

জনপ্রাণী নাই।

বাণী সিনেমা গৃহ লোকে লোকারণ্য। টিকিট কিনিতে না পাইয়া বহু লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। একদল জোর-জোবরদস্তি করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার দুই দিকের ব্যালকনির অবস্থা এরূপ যে আশঙ্কা হইতেছে ভাঙিয়া না পড়ে। স্টেজে যবনিকা উঠিয়াছে। চিত্রতারকা ইন্দুবালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন—তাঁরই গাওয়া 'মিলন'

ছবির কয়েকখানি দেশবিখ্যাত, বালক বৃদ্ধ যুবার মুখে মুখে গীত গান—'জংলা হাওয়ায় চমক লাগায়', 'ওরে অচিন দেশের পোষা পাখী,' 'রাজার কুমার পক্ষীরাজ' ইত্যাদি।

এমন সময় রাজ বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে টকিহলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শ্রীগোপালবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাশেই অদূরে নীরেনবাবু বসিয়া। বলিলেন,—"বা রে, আপনিও এখানে!"

হঠাৎ-ধরাপড়া চোরের মত থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রীগোপালবাবু বলিলেন, —"আসার ইচ্ছে ছিল না, কি করি, কি করি—মেয়েরা—ওদের আনা—ইয়ে—সাহেবের লেকচার কেমন হল? লোকজন হয়নি?"

—"কি করে হবে? আপনারা সবাই এখানে। লোক কে যাবে?"

—"সায়েব কোথায়? চলে গেলেন?"

—"এই যে—"

রায় বাহাদুরের পিছনেই দাঁড়াইয়া স্বয়ং আইনস্টাইন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে উঠিয়া আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া নিজের চেয়ারে বসাইলেন।

একটি খবরের কাগজের কাটিং রাখিয়াছিলাম। এটি সেখানে জানাইয়া দেওয়া গেল—

এখানে আলুর দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দর কিছু কমের দিকে। ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য সাবডিভিসনাল অফিসার মহোদয়ের চেষ্টায় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমা গৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সংগীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন, রানাঘাটবাসিগণ তাহা কোনদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপূর্ব জনসমাগম হইয়াছিল—সেও একটি দেখিবার মত জিনিস হইয়াছিল বটে। লোকজনের ভিড়ে মেয়েদের ব্যালকনির নীচে বরগা দুমড়াইয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে ধরা পড়াতে একটি দুর্ঘটনার হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

পুঁই মাচা

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি, বিশেষ কোন কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে? দাও না একটি ঘটি? আঃ ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন—কেন...কি আবার....কি—

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তসুরে কহিলেন—দেখ রঙ্গ কোর না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোর। তুমি কিছু জান না, নাকি খোঁজ রাখ না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? কি গুজব?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগদী দুলেপাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। —সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন —একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ল না,—ও নাকি উচ্ছুগগু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগদী-বাড়ী উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর!—ও!.....

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? —আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।...হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে লোকের চোখ নেই?....পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কি-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কি-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে...

চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে হলদে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উবড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোন দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধহয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল —চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দুটো পয়সা বাকী আছে। আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো....ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা.....কেমন মোটা মোটা....

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতে অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমর্ত্যই তোমাকে তারা দিয়েছে পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে দু'দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা....আর উনি তখন আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হ'ল না....যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?...কোথায় শাক, কোথায় বেগুন আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফেল বলছি ওসব....ফেল।...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।...সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে....তুমি আবার...বরং....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা তুই যা, দুর ক'রে বনে দিয়ে আয়....

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না।—নিঃশব্দে খিড়কি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়ে উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশে-পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো কেষ্ট

মুখুয্যে....স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ড়ে, মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কি স্বভাব? রাম বলো, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়....

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হলে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগগু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকী, এই তো?... সমাজে ব'সে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব, এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।...পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না? ...গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না?—দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর— শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস—রাজার হাল! দুই ভাইয়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা-ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়করি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবুর গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রোদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশের ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, যা শীগগির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি! কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটি লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া

ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন, মুখুজ্যেবাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল, খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বল মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুজ্যে-বাড়ী ও পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা! —পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণে খুপ খুপ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল....কে যেন কি খুঁড়িতেছে...দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে—কর্তাঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি...সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিনি কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বলো না। ...আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ খুপ শব্দ...তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল,

যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ...তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিতি থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও যোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।....

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান-সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়ে ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তর দিল, হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছো মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুগিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে! যদি গোসাঁইয়া চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন ঊর্ধ্বমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে!

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে? আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্যে-বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত!

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

—হাঁ দে মা, এক্ষুণি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?—সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন—একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নীচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল, মা, ঐ একটু....

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মা'র সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।...ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও পাড়ার তিনুর বাবাকে। ওবেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদি বলছিল, ধীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা! খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হ'ল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কি না, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা ধরা গন্ধ, আর মা'র পিঠেতে কখনো কোন গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল-কোরা একটু নেবো?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ওবেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব!

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশখানা খাইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি?.....ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোন মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘটনা কি না!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি। ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও...দু'টো মাস তো...

ওপাড়ার ঠানদিদি বললেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি? দেখো তো, কেমন না যান!

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত..তার অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া

লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বলব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি.....

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে রাখো, ও-রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়া ছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—নাঃ সব তো আর....তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বললেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে, ও টাকা, আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার...

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে...ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খাই খাই...আর কত কি! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম—মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোন কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!...পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুজ্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি....প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কসুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হ'ল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই

ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে....

—দেখতে পাওনি?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে...যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে? ...পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।..

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন?

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে..

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে ব'সো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেলে....খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল—মা দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়াগাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।....

পুঁটি ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস খস শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞেস করিলেন—দিলি?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ...রাতও তখন খুব বেশী। ...জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক-র-র-র শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল...যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!...

দ্রবময়ীর কাশীবাস

দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী—কারো সঙ্গে কারো কথাবার্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আমকাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকুরণের বাড়ীর চারিধার বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিনকালে ঢোকে না।, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'যাঁওকো' 'যাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনে রাতে মশার বিনবিনুনি।

দ্রব ঠাকরুণের নাতি বল্লে—ঠাকমা, সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো?

দ্রব ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাস কাল তিনি মালেরিয়ায় ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুণ পুরোনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ীর ন' ঠাকরুণ এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর—ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্চে!...একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না— এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা?

পরে মিনতির সুরে বললেন,—ন ন'বৌ, নক্ষ্মী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, নেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আলনায় পুরনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে দ্যাও—

—চেপে ধরবো, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-রো—ন-বৌ—চেপে ধ-রো—আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন ক'রো না, ছিঃ। টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কানু আসবে, বিন্দে আসবে—তোমার নাতিরা বেঁচে থাক, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ—আ-মা-কে—দে-খে-না—ন-বৌ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকা না, চুপটি করে শুয়ে থাকো—

—আমার গো-রু! গো-রু উ-ত্ত-র-মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে গ-য়-লা-র অ-ড়-ল ক্ষে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু। আমারাও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘণ্টা খানেক পরে বৃদ্ধা ন'ঠাকরুন আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কম্প থেমেচে দিদি?

ক্ষীণস্বরে লেপ-কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গোরু! আমার গোরু তো—

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাকশীতে ই. ব. আর-এ—ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী এসে দিন সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ী তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে, দিনমানেই বুনো শূওর লুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক। মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে! এখেনে কি মানুষ থাকে না কি?' মনোরমার খাঁড়ার মত নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতির ছেলের খোকনমণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকুরণকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন' বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামিহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন'ঠাকরুণ তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি!

ন'ঠাকরুণ আপনার জন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না—তবুও ঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুণই দ্রবময়ীকে দেখাশুনো করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'একটা কথাও বলেন।

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাসখানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোশক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায়নি—মুখ তেতো, মাথশ ভার, শরীর ঝিম ঝিম করচে।

ডাক দিলেন—ন'বৌ, গোরু এনেচ দিদি?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুণ উত্তর দিলেন—কে ডাকে? দিদি? ঠেলে উঠেচ?

—বলি আমার গোরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালডা? জ্বর ছেড়েচে?

—ছেড়েচে—ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে—

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুণ টেমিটা জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাড়ি আর একটা তেড়ো পাখীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। দ্রব ঠাকুরুণের জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হ'ল পাখী দুটো বলচে :—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু। চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে? থাম না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুণ মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাৎনী—একঘর বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়।

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালোবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বারবর করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকরুণের মনে হ'ল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ীর পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর পেড়ে আললেন, দুটো, সজনে শাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্যে গিন্নীর সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নীর ছেলে ক'টি লেখাপড়া শেখে নি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—দ্রব ঠাকরুণের ক'টি নাতি চাকুরে, এজন্যে দ্রব ঠাকরুণের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস করলেন—জ্বর হয়েছিল না কি শুনলাম খুড়ীমার?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল ঘাটে যাচ্চি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমন সব নাতি নাৎনী থাকতেও তোমার এই দুর্দশা—সবই কপাল!

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোন বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশসেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। দ্রব ঠাকরুণ বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজ্যেদের সেজ বৌ পেছন থেকে বল্লে—কি দেখছেন, ও খুড়ীমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কি-না এক আধটা মা—একটা গাছ কাঁঠাল, সব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো—নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পানার মধ্যেই চোরের ঝাড়—দ্যাখ তোর, না দ্যাখ মোর। সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মো জ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়ীমা ঘাটে যাই—

দ্রব ঠাকরুণ বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলো চাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন এমন সময় দেখলেন বাড়ীর পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস খস শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুণ হাঁক দিলেন—কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুমা—

—কেন ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখশনে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ এগারো বছরের বালিকামূর্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বল্লে—যা তোর ঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দ্রব ঠাকরুণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বল্লেন—হ্যাঁ যা—তোর বাবা নেবু গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে—তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিস নে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে—এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্রব ঠাকরুণ আপন মনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বল্লে—ও ঠাকুরমা—

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা—

—নেবু দেবেন না?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন—তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি—

মেয়েটি তাই করলে। দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে না কি?

—তা তো জানিনে ঠাকমা।

—যা, নিজে যা—তবে একটার বেশি নিবি নে—বুঝলি?

দ্রব ঠাকরুণ খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েচেন, এমন সময় মুখুজ্যে বাড়ীর বড় ছেলে অতুল এসে বল্লে—ও ঠাকমা, শুয়েচেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু আমার নেই।

—কেন আপনার বাড়ীর পেছনে হরি রায়ের দরুণ জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলি গাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে দ্রব ঠাকরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রী করতেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু' পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটলেও তাঁর মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রীর কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল, কারণ ডুমুর পাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু দ্রব ঠাকরুণ তাকে ডুমুর পাতা পাড়তে দেন নি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে দ্রব ঠাকরুণ বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলের ঘেরা বাড়ী, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন'ঠাকরুণ ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, দ্রব ঠাকরুণ কিন্তু লোকজন, আড্ডা, মজলিস প্রভৃতি ভালোই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুর-মা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো লেবু পাওয়া যায় না। বুড়ীর কাছে বসতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে

দিয়েচে....তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু দ্রব ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ মন যাকে আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জন বৈকাল বেলাটিতে...তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

দ্রব ঠাকরুণ আপন মনেই বকে চলেচেন, নাৎবোয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালোবাসে....এই ধরনের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাকুমা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্চে হচ্চে—তারপর শোন না....

—মা বকবে— নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন—তারপর খোকনমণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে দ্যাও —তা আমায় বললে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার— একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে। ...আপনি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে —তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি?

—আমি এবার যাই ঠাকমা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা? দিদিশাশুড়ী বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ীর বাসরে একখানা গোরুর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খুকী কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বল্লে—ও ঠাকমা, কে যেন এল গাড়ী করে—তোমার ওই তুঁত-তলায় গাড়ী দাঁড়ালো—

বলতে বলতে দ্রব ঠাকরুণের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দু'হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাকমা—

দ্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন—কানু? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্লে—এ হরিকাকার মেয়ে কন না? ওঃ কত বন হয়ে গিয়েচে—ভালো আছিস কনকী? নে দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা —

পুঁটলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দ হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে—নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ী আসবার সময় কি কি অপূর্ব জিনিস না জানি নিয়ে আসে!

দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে বুড়ীকে মনে পড়েচে তা হোলে? বাবাঃ, সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনও কি সেরেচি। এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে দ্যায়—ওই ন'বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পর ন'ঠাকরুণ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেচেন, অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ী এখানে বেঘোরে মারা যাবে? পালাজ্বরে ধরেচে—এই আজ ভালো আছে, কাল এমন সময় লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে দ্যাখে, কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হোল।

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—ভালো কথা, ও ন'বৌ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন'বৌ।

—তা দ্যাও দুখানা, নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মত ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা' বলবো তা মুখের ওপরেই বলবো বাপু—

ফলে ন'বৌ দু'খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ীর দিকে চল্লেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমার পরামর্শ হ'ল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়ীতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন'বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থ ধর্ম করার সময়ই তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে সাত মাস বয়সে ন'ঠাকরুণের সে ছেলে মারা গিয়েচে—সেই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয় নি।

যাবার দিন দ্রব ঠাকরুণ প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন'বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন'বৌ, আমায় আশীর্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি পরোটা জলখাবার, তেল ঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ী হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন —

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল, বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী দ্রব ঠাকরুণ যে-সময়ের-যা সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন'ঠাকরুণকে, কতক এ'কে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বল্লে—শসা খাবে ঠাকমা?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাকমাকে মনে রাখনি তো? হ্যাঁ-রে? কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উঁউ—

ন' ঠাকরুণ চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

দ্রব ঠাকরুণ ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌঁছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ীর নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে দ্রব ঠাকরুণের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। দ্রব ঠাকরুণ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হোলেন।

দ্রব ঠাকরুণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে জেলার লোক। কথাবার্তার ধরণ ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জিত। যশোর জেলার মানুষ দ্রব ঠাকরুণের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে দ্রব ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে বল্লেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

দ্রব ঠাকুরণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও!

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

দ্রব ঠাকরুণ ভালো বুঝতে না পেরে বল্লেন—কি বল্লেন?

দ্রব ঠাকরুণ 'বল্লেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন'—'ও' কার-এর উচারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ দ্রব ঠাকরুণ কখনো শোনেন নি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্রজাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বল্লেন— সে তো আমার নেই!

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পোরে?

—এই সাদা থান প'রেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো?

বাড়ীখানা গলির মুখে হ'লেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ীঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়ীতে একা থাকা দ্রব ঠাকরুণের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেল! নাঃ, কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তার পরদিন বন্ধুর হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েচে। বন্ধুর মার নাম নীরজাবাসিনী, দ্রব ঠাকরুণের চেয়ে তাঁর বয়স দু'পাঁচ বছর কম হবে, মাথার চুল এখনও পাকে নি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

দ্রব ঠাকরুণ এঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন

গিয়ে। কর্মবাদ, সেবাধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, দ্রব ঠাকরুণ অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেন নি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নামে বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে দ্রব ঠাকরুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেন নি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোন কথা বল্লেন না। এমন বর্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্যন্ত জানে না! দ্রব ঠাকরুণের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কেথোও যাননি। গোপীনাথ পুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনো কারো মুখে শোনেনও নি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অতবড় নামের কোনো ঠাকুরের কথা কই—কেউ তো তাঁকে বলে নি?

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই দ্রব ঠাকরুণ বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্মবাতিকগ্রস্তা। সাধু সন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও নতুন ধরণের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মত হাত জোড় করে বক বক বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব কথা জিজ্ঞেস করবে, কর্মফল কি, পুনর্জন্ম কি, হেনো তেনো। রাস্তা-ঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে দ্রব ঠাকরুণের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু সন্ন্যাসী দেখলে সর্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুণ শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্ছে না কেন?

দ্রব ঠাকরুণ শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দু'ঘণ্টা ধরে নাক টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে

মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যানে না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। দ্রব ঠাকরুণও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল কোথায় বা সুজি কেনা হবে। রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালী মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্ছে আসচে। কি জানি ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতেও পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন'বৌ কি মুংলিকে অত যত্ন করচে? —তাঁর মত? তিনি যে পেটের মেয়ের মত...না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পরে ন'বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে...তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন'বৌ লিখেচে মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ীর দাওয়ার খুঁটি না বদলালে নয়। কানু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দিদি, চলো যাই...সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—মরো-না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—করন্যাসটা অভ্যেস করচি কি না, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুরে বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল দিকি!

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকবেন তাঁর ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ করি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়। গীতা-টীতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যেস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাণ্ডমাণ্ড, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন। আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি! দ্রব ঠাকরুণ না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বলবেন—আহা-হা! কি চমৎকার।

দ্রব ঠাকরুণ বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নরিজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু'খানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হ'ল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরি হ'ল। লুচি ভাজা হ'ল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হ'ল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালী। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুণকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়ীতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ?

—হ্যাঁ

—নাম কি?

—দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—কি সর্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায়?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতার ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলচেন—

আঃ কি বিপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝি নে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দু'জনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবীর কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর! তবে সোয়ামী কোথায় যাবে মেয়েদের? ঢং দ্যাখো না—! যাই হ'ক, বহু তর্ক করেও দ্রব ঠাকরুণকে দ্রব করা গেল না। নাম দ্রবময়ী হ'লে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি মতে একজন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হ'লে তিনি আর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মত একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর কাছে। পুরনো একছড়া সোনার হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে?

—টাকা সার্থক হ'ল, দিদি—

—তোমার নিজের হার?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু।

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে,—তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনো মেয়েমানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাগী এত রাত্রে করে কি? হুস হুস করে অত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

দ্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও দ্যায় না রাত্তিরে?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি-জন্যে দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুণের পিত্তি জ্বলে গেল। কিনগে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুণ তাঁকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন এখানে কি হ'ল! সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বল্লে—আচ্ছা ঠাকমা, শেষ বয়েসে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি! হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

দ্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাকুমা?

—আমার এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাকমা? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম শেখো না। চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্তা—ঠাকুমা তুমি কি?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়ীটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুণ সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক। শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথক ঠাকুর কথকতা শুরু করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞাসা করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দ্যাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড়ো একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু'তিনখানা পান্সিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথক ঠাকুর

সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিব-লোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হ'ল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লে—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুণ লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্কভাব, বিশেষ কোনো কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হোলে খুব ভালো লেগেচে বোধহয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা-গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দু'টো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মালদ' ফজলি—মায় ন্যাংড়া পর্যন্ত। আমি তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপন অনেক দেখলুম। এইবার পরকারের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরণ শোনো না, ভাটপাড়ার ভটচাজ্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি ব'লে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটো। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্ব জন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোনো কথা বল্লেন না। তাঁর ওর কথা একেবারেই ভালো লাগে না। মাগী যেন কি! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না। মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লান মুখে ছলছলে চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েচে মুংলী, তেমন দুধ ত আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মত পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখুজ্যে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ী-মা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ীর চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাকমা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েছে কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপূজা করচেন। দ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আরও ওই মাগীর জ্বালায়...

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে—বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন! সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হ'লে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হ'তে হ'লে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্বেই শনিবার সকালের গাড়ীতে কানু এসে হাজির হ'ল। দ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপীনাথপুরে নিয়ে চল ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর দু'মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুণ দেশের ইস্টিশানে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলেচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ —মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর মত? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর জন্ম টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাকমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশীপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল ন'বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদয়ে নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠানের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাকমা, ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম —আমাদের কথা মনে ছিল।

ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল

চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের সুটকেস হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসাত হইতে শিয়ালদ' পর্যন্ত 'তাঁতের মাকুর' মত যাতায়াত করিয়া ও ক্রমাগত "দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি এক কথায় যত রকম ব্যথা, শূলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—" বলিয়া চিৎকার করিয়াও চাকুরী রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণলালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেন নি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনার ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট।

—দেখুন, আগেও আমি অন্ততঃ সতেরো বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা ট্রেন দশটা একুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে বসে ছিলাম শুধু আপনার জন্যে। নিতাই দু'বার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে এসেচে। লেট এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরনো কথা। ও কথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেচেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুশকিল হয়েচে, আচ্ছা আসি—

—যান আসুন—

কৃষ্ণলাল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নিত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হ'ল!

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরেই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যানভাসারের কাজ ক'রে। জানেন না যে ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েচে বলুন দিকি? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরোনো ক্যানভাসার ব'লে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেচি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক'দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজি হয় নাই—নৃত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নৃত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্তাকে গিয়া পর্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না।

মুশকিল এই, চাকুরী যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতই তার গতিপথ নির্মম, ধরাবাঁধা!

সুতরাং চাকুরী গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে! স্নান-আহার হয় নাই।

২৫।২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাঠকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগার নির্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতেরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্ট ঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেজের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন রুমমেট ট্রামের কণ্ডাকটার, সাড়ে চারটার পর সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘণ্টার জন্য বাসায় আসে এবং তারপরেই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে বলিল—এত বেলায়?

—বেলায় তা কি হবে? চাকরীটা গেল আজ।

—সে কি! এতদিনের চাকরীটা—

—কত করে বললুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ? গরীবের কথা কে রাখে বলো!

—হয়েছিল কি?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে তুমি ক্যাশ ভেঙেচ।

—তাইতো....তাহোলে এখন উপায়?

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে।

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস হোটেল হইতে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী—

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরনে আধ ময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ী, হাতে গাছকয়েক কাঁচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বছর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন তার তাহার কি আছে? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যানভাসারের পদে বাহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়ীতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর তখন বয়স ষোলো সতেরো। রূপ দেখিয়া রাস্তার লোকে চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মা'র হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা—গোলাপীর ঘরে মেহগনি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাঁচ বসানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা, আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের সুরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ী তার নিজের না হ'লে চলে না আর—তা তেমন কপাল কি—এই এক বাড়ীতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—

—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ি এ পাড়াতেই আছে—তাহ'লে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওলো, একটু রয়ে সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায় বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক'দিন বললাম একখানা ঢাকাই শাড়ী, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানোর, তা বুড়ো মড়া আজ সাত মাস ঘুরুচ্চে—আজ এলে হয় একবার—ওর দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়ী? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ী, চেয়ার, এমন কি শেষে কলের গান পর্যন্ত। কোন সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ী করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ী) কালীঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেখে নাই তার আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল— রেলগাড়ীর কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে এই বাড়ীটিতে থাকিতে হয়! তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাকরীটা গেল!

গোলাপী বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি গা!

—বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা?

—খরচ হয়ে গেল!

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল? তোমার এখনও দোষ গেল না! তা ওরা কি করে রাখে তোমায়? কাল কোথায় গিয়েছিলে?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বর সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি? রাত দশটার পরে ইস্টিশনের গেটে আমায় ধরেচে। রূপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে না কি? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে, না হয়নি? আমার অদেষ্টে ঝিগিরি নাচচে সে তো দেখতে পাচ্চি। তখন বন্নু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দু'জনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কলকেতা আর কলকেতা! কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবো নি। এখন থাকো কলকেতায়? কে এখানে খাওয়ায় দেখি।

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাকরী নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে! এখন আর কি তোমার হাত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত বেদনা মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক গো গোসাঁই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না, সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন!

—তাহ'লে বল চাকরীতে নেবে কিনা?

—নেবে না আবার? একশো বার নেবে—আমি যাই এখন ঝি-গিরি ক'রে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে! কি অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম!

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—ব'সো, দুটো মুড়িটুড়ি মেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহ'লে বক্তৃতা এখনও দিতে পারি, কি বলো?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মত কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের, ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মত নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়া বলিল—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হ'ল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম ক্যানভাসার—হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না!

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বের্দ্দ বয়সে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনারবেনেদের ঠাকুরবাড়ীতে একটা ঝিয়ের দরকার, সকাল-সন্ধ্যে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমায় বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগার এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহ'লে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধ্যের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে, তেমন-বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন আর তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছিল দু'মাসের, মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু, আমাদের রেণ্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্চেন—চাকরীটা গেল, হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া জোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে? দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিনদিন কাটিয়া গেল, দু' একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু'চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল-ভাতে কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু' পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সঙ্গে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্মল জল।

মেসে ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন। বলিলেন—কিছু হ'ল?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবচি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু' মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেরও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন? আপনি জিনিসপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র সমেত (একটা টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা) কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিসপত্র রাখিবার মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায়? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে—মধ্যে একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাহিরের ফুটপাতে বসিয়া ছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না)—কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ী গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিসপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলাল জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার স্টীমারঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সায় একটা ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়।

এই সময় একটি ছোকরা ব্যাগহাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেণ্ট-বাঁধানো রাস্তার উপর পাতিল। বসিতে যাইবে এমন সময় ছোকরা হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিক চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে ব্যাগটা দেখবেন? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ করিয়াছিল, ছোকরা একজন ক্যানভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যানভাস করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস

—হাতকাটা তেল—সার্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোকরা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি! লাগে না?

ছোকরা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কাণ্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এক কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পৌঁছিতে বেলা তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূর সম্পর্ক জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখা শোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিন টেকে? আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পূর্বে দু পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই—এখানকার লোকে কথাবার্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায়

রাস্তায় ভিখারীও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল—রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এরই মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহারা চড়কতলার ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দু'টি মুখে দিতে না দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু'পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা...এ দোকানে ও দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া...চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘণ্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়। কয়েক বাড়ী যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু-একটা কথা বলো, গল্প করো—এক আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা, সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরণের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলার কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার, দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পুব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে। ওপরের তিন তলায় তিনটি মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্মব্যস্ত, ঘড়ি ধরিয়া কাজ কলিকাতায়, 'সময় গেল। ছ'টা বাজে, কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে.....এখনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে না বাজিতে, এতটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়াল-দ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল.....শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! যত প্রকার বাত, ফুলা, শূলানি, কনকনানি, মাথা ধরা, পেট বেদনা, ইহার একমাত্রা ব্যবহারে ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে, —এই চলিল বেলা বারোটা পর্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কি জীবন! কি আনন্দ! কি পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে, রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায়, যে পয়সা আয় করিতে জানে, সে-ই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনোরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ্য, কখনো পা গুটাইয়া কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোনো উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটে আর চাকুরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যানভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া.....তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যানভাসারের চাকুরীর মত সম্মানের চাকুরী, আরামের চাকুরী আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মানসম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাওয়া জীবন ধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু'-এক বিঘা ধান করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মানকচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল নাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরণের, সেখানে ক্যানভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর ধরিয়া কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে।

ট্রেনে পুরানো ক্যানভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়, কবিরাজ অনঙ্গমোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানী—ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ফার্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে।

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়েথাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন কোম্পানীতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই তো, থাকলেই দেখে—আমাদের কোনো চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানী, হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু'শো টাকা বছরে আয়ের সম্পত্তি? বলো কি! তবে তো তুমি—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরাতন বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল ঘুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল যে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে, পয়সা রোজগার আছে, তারপর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া। মরিতে হয় এখানেই মরিবে।

পনেরো বিশ দিন এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকুরী মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোকরা ক্যানভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা পায়ে, থিয়েটারের রামের মত গলা, এই সবাই চায়; বয়স হইয়া গেলে—মানে, এখন উঁহাদের লোক আছে, দরকার হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু'দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরিটোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার স্টীমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যানভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যানভাসারেরা তাহাকে—কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে!

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট সুটকেসটি হাতে লইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া ক্যানভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চা রাখা দরকার তো বটেই, তাছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন ছোকরা ক্যানভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।—দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁতশূলানি, হাত বেদনা, পিঠ বেদনা.....ভদ্রমহোদয়গ। এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে.....

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ ছয় সগর্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমার একটা ছোট ফাইল!—

কৃষ্ণলাল গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা একশো ছয়ের সি হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের অফিসে.....আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্ছি—

দিন পাঁচ ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ সুটকেস হাতে ঝুলাইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। আফিস ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শোনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। বসু মহাশয় বলিলেন, এ কি হচ্ছে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আজ্ঞে আজ্ঞে, একবার চর্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাই তো বলি এ কি কাণ্ড! গত দিন পাঁচ-ছ'য়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের স্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক'মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো ডাল সিজন যাচ্চে, আমি তো অবাক; সবাই বলে লালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে.....আমি বলি আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি, আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যানভাসারদের মত থিয়েটারী রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই আফিসে আসুন এক্ষুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যানভাসার অ্যাপয়েণ্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক ক'রে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চ'লে আমার গাড়ীতে—

সন্ধ্যাবেলা।.....নবীন কুণ্ডুর লেনে খোলার ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্ত্রাকাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল —গোলাপী ও গোলাপী, বাইরে এসে এই জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেরে গিয়েচে—

অসাধারণ

সীতানাথ ডাক্তারের দোকানে বসিয়াছিলাম। সকালবেলা। খবরের কাগজ এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই —কারণ মফঃস্বল জায়গা। খবরের কাগজ না পৌঁছিলে যুদ্ধের আলোচনা ঠিক জমে না। অদূরবর্তী বাজারে প্রাভাতিক সওদা সারিয়া নবীন মুখুয্যে, শশধর মুহুরী, কেনারাম মুখুয্যে, মন্মথ মুখুয্যে, বলাই দাঁ প্রভৃতি ভদ্রলোক সীতানাথের ডাক্তারখানায় স্নানাহারের সময় পর্যন্ত রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহারা কোন চাকুরী করেন না। দু-একজন পেনসনপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, এক-আধজনের বাপের পয়সা প্রচুর। ইঁহারা জার্মানি ও জাপানের সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদবাণী করেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এমন কথাবার্তা বলেন, যাহা স্বয়ং হিটলার, চার্চিল ও তোজোরও অজ্ঞাত। হিটলার কি ভুল করেন, চার্চিলের কি করা উচিত ছিল, জাপান এমনটি না করিয়া যদি এমনটি করিত তাহা হইলে কি ঘটিত—এ সকল মূল্যবান উপদেশ সর্বদাই সেখানে উচ্চারিত হইতেছে।

বর্তমানে কেনারাম মুখুয্যে বলিতেছিলেন—আরে, এই তোমাকে বলি শোনো ভায়া। ভুলটা হিটলারের হোলো কোথায় শোনো। ডানকার্কের যুদ্ধের পরেই—

শশধর মুহুরী বলিয়া উঠিলেন—আঃ, আপনি ঐ এক শিখে রেখেচেন ডাককার্ক আর ডানকার্ক। আসল ভুল সেখানে নয়, আসল ভুল হলো—

এমন সময় একটি পুরুষের হাত ধরিয়া একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারখানার বারান্দাতে উঠিয়া আসিল সম্মুখের রাস্তা হইতে। পুরুষটির বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোন বয়েস হইতে পারে, রোগা, পরনে খাটো ময়লা ধুতি; মেয়েটির বয়েসও নিতান্ত কম নয়, তবে পুরুষটির অপেক্ষা অনেক কম, ত্রিশ বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালি-লাগানো শাড়ী, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবত অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চাও?

—বাবু, এঁকে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রুক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি?

মেয়েটি বলিল—হবে আর কি। ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দুমাস। তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন। ...বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সরে এসো এদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হুঁ, দেখবো কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদ্দিন এমন হয়েচে?

পুরুষটি এবার ক্ষীণসুরে বলিল—তা বাবু অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগচি। আর এই কাশি, এ কিছুতি যাচ্ছে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অধৈর্যের সুরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! খুব খ্যামোতা তোমার! আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি—তিনমাস ওঁর অসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওঁর কথা শোনবেন না। ওঁর কি কিছু ঠিক থাকে? নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবের যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি, অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েচে কতদিন?

—তা বাবু চার-পাঁচ মাস হবে। সেবার যখন...

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তো সব জানো কিনা! চুপ করো। না বাবু, দুবছর হয়ে গেল। আমার হাড় মাস ভাজা করে খেলে ওই মিন্সে। কি জ্বালায় যে পড়েচি আমি, মরণ হয়তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার?

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ী কোথায়?

মেয়েটি বলিল—বাড়ী এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি, ওই ওনারে নিয়ে। বিয়ে করা সোয়ামী, ফেলতে তো পারি নে। আজ দুটি বছর উনি বিছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন না। কত অসুদ বিষুদ করলাম আমাদের দেশে ঘরে, যে যা বলে তাই করি, কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষ উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি—ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই—একটু দেখুন আপনি ভাল করে, আমার আর কেউ নেই—

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম— তোমার স্বামী কি কাজ করে?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে! ও করবে কাজ? সেদিন পূবের সুয্যি পশ্চিম পানে ওঠবে না?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাবু, কাজ আমি করি নে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করবো কি। ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজের বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু।

মেয়েটি বলিল, তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে? বাবু শুনুন তবে বলি। কষ্ট দুক্ষুর বার্তা ও কি জানে। সংসারের কোন খোঁজ রাখে ও?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্র সুরে বলিল—তা যা বললে ও সে কথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতি দ্যায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারি নে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারি নে—এই দেখুন বাবু এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও, আর বাবুদের সামনে তোমার পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দরদ ওর। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বললে না?

পুরুষটি এ কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভাল ধাই! তা যে বাড়ী যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমার চিকিচ্ছে করাচ্চে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! তুমি কি জানো ও সবের? বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালই। এখন আপনাদের এখানে হাঁসপাতাল হয়েছে পোয়াতিদের জন্যি। সব লোক এখনে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে? ধান ভেনে যা হয়। দু মন ধান ভানলি পাঁচ কাঠা চাল পাওয়া যায়—কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতর গিয়েচে, আর তেমন খাটতি পারি নে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম।

—জাতে হাড়ি বললে না?

—হ্যাঁ বাবু।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে? সে তো অনেক দূর।

—নৌকো করে এ্যালাম বাবু।

—ভাড়াটে নৌকো?

—অনেক কেঁদে হাতে পায়ে ধরে তেরো গণ্ডা পয়সা ঠিক হয়েল। ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি। আমি তাকে ধরম বাপ বলে ডেকেচি।

—ধানের চাষ কর?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানের জমি। বিচুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে। না খুঁচি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না।

বেলা হইয়াছিল। সেদিন চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে প্রায়ই দুদিন অন্তর মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয়। কখনো ঔষধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতে পায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে, কবে রোগ সারিবে, নৌকা ভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন? ওর রোগ সারবে?

সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না। নানান উপসর্গ। ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করচি, এই যা।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে একথা হয় নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন এমনধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। হয়তো নিজে আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধপথ্য ও নৌকোভাড়া যোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিলাম—শোনো এদিকে!

—কি বাবু?

—ধাইয়ের কাজ করতে পারবে?

সে হাসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো করি বাবু। তা আর পারবো না?

আমি উহাদের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া। সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীর প্রয়োজন উপস্থিত হইবে! পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিয়ে। বহু কষ্টে পড়েচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে দেড় টাকা। আমার রোজগার বড্ড মন্দা হয়ে গিয়েচে। আর চালাতি পারচি নে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেবো। এক কাঠা চাল, একখানা কাপড়, আর না হয় আট আনা পয়সা দেবে—তাই নেবো। আমার খাঁই নেই বাবু অন্য ধাইয়ের মতে। তা বাবু আমি রাত্তিরি আঁতুড়ে থাকবো, সেঁক তাপ করবো, ছাড়া কাপড় কাচবো—

অনুনয়ের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমার বাসা। আর দিন আষ্টেক পরে আমার বাসাতে দরকার হবে ধাইয়ের। চলো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো।....পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায় ছায়ায় বসে থাকো, বুঝলে?

বাড়ীতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাড়ীতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ধাই, উহাদের কি জ্ঞান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল আসল কারণ, মেয়েটি দেখিতে ভাল এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় দুজনে চলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া মেয়েটি ডাকিয়া বলিল— ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—বলো—

—আপনার বাড়ীতে হোলো না?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েচে কি না! তাই—

যাক গে বাবু। আপনি অন্য এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না?

—দেখবো। আরও এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

—দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃতে প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়? লেখাপড়া জান নাকি?

পুরুষ বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ী?

—আছে বাবু, ও রোজ পড়ে আমাকে শোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যানা করতি হবে না, চুপ কর। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দে বেলাডা। তা ও বই পড়ে বোজবার মত অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামার বাড়ী ছেল ধরমপুকুর। শূয়োরের ব্যবসা ছেল মস্ত। অবস্থাও ছেল ভাল। এখন তাদের কেউ নেই, মরে হেজে গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দশা হবে কেন ওর বাবু? ও ছেলেবেলায় মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল?

বৌটি ইহার উত্তর দিল, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।

—অপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু।

—পাশ করেছিলে?

—হুঁ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে গিইছিলাম।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, ও পাশ করে দু টাকা ইস্কলাসি পেয়েল।

বৌ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ করো দিকিনি।

পুরুষটি তখনও ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই। বলিল—বাবু, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হোল না ওর। মামারাও মরে হেজে গেল। ও যেমন মেয়ে, আমার হয়েচে সেই যারে বলে—বানরের গলায় মুক্তোর মালা। সব অদেষ্টের ফল আর কি। আমি ওরে খেতি দেবো কি, আমি অসুখে পড়ে পর্যন্ত ওই আমারে খেতি দ্যায়। আমার এই চিকিচ্ছেপত্তর ওই সব চালাচ্চে! আজকাল রোজগার নেই ওর—পেট ভরে দুটো খেতিও পায় না—আমারে বলে, তুমি সেরে উঠলি আমার—

বৌ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার! বাবুর সামনে ওই সব কথা? চলো বাড়ী তুমি—ঝাঁটা মারবো তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ! মুরোদের আবার ব্যাখ্যানা হচ্চে—লজ্জা করে না তোমার?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বলিলাম কেন, ও তো ভালই বলচে। ওর যা ভাল লেগেচে, ভাল বলবে না?

বৌ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে বলেছে ওকে?

—তা বলুক। কোনো দোষ হয় নি।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটিয়ে—

—চেষ্টা করবো। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড্ড কষ্ট হচ্চে! ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মন করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধুর বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয়? তাও বাবু শুধু খাওয়া। পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড় ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখান কাপড় পাবো।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়ীতে কে অন্তঃসত্বা আছে এ সংবাদ যোগাড় করা আমার কর্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মন্বন্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল ফ্যানও অমিল। দশবিশ সের ফ্যান কোন গৃহস্থবাড়ীতে থাকে না, যাহা থাকে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু-হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে শুরু করিল তাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্ধোলঙ্গ অনশনক্লিষ্ট দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্যোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম। কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগণ স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকা ভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথে ঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসে নি। আর আসবে কি, এই তো কাণ্ড। ওষুধের দাম দিতে পারে না—ক'শিশি ওষুধের দাম এখনও বাকী।...

অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমার রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খুলা হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু দুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খাইতে আসিত। উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে?

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায়?

—ওই পুরনো ডাকঘরের পেছনে বটতলায়। আজকাল হাঁটতি পারে না মোটে।

—চলো দেখে আসি।

কৌতূহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম! গিয়া মনে হইল না-আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত—কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরনো পোষ্টাফিসের পিছনে যেখানে গভর্ণমেণ্টের কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনে বটতলায় এক ছেঁড়া চাটাই পাতিয়া বৌটির খোঁড়া স্বামী শুইয়া আছে। মনে হইল লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে, এত রুগণ। মেয়েটি তার পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুর বেলা। রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে, কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের টিউবওয়েল হইতে শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু ঢোঁক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাবো—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন?

মেয়েটি বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটি বাটি কিছু নেই। কিসে জল আনি?

—কেন মালসাটা?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারে নি। আধ মালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেবো। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড্ড কষ্ট হয়েছে বাবু—দিন না একটা কাজটাজ জুটিয়ে? এক কাঠা চাল শুধু—খুব কমের মধ্যে করে দেবো—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

রাসু হাড়ি

সে বার আষাঢ় মাসে আমাদের বাড়ী একজন লোক এসে জুটলো। গরীব লোক খেতে পায় না, তার নাম রাসু হাড়ি। আমরা তাকে সাতটাকা মাইনে মাসে ঠিক করে বাড়ীর চাকর হিসেবে রেখে দিলাম। প্রধানতঃ সে গরু বাছুর দেখাশুনো করতো, ঘাস কেটে আনত নদীর চর থেকে, সানি মেখে দিত খোল জল দিয়ে।

বাবা মারা গিয়েছিলেন আমাদের অল্প বয়সে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই বড়, লেখাপড়া আমার গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত। ছোট ভাই দুটি ডাণ্ডাগুলি খেলে বেড়াতো, এখন চাষের কাজে আমাকে সাহায্য করে।

রাসু বছরখানেক কাজ করার পরে একদিন রাত্রে আমাদের বড় বলদজোড়া নিয়ে অন্তর্ধান হ'ল। আমাদের চক্ষুস্থির, তখনকার সস্তার দিনেও সে গরুজোড়ার দাম দু'শো টাকা। আমার ছোট ভাই সত্যচরণের (ডাক নাম নেন্টু) বড় সাধের বলদ, সে ভালো গাড়ী চালাতে পারতো বলে শখ করে জন্তিপুরের গোহাটা থেকে ওই গরুজোড়া কিনে এনেছিল।

ভোরবেলা মা ওঠেন সকলের আগে। সেদিন উঠে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখেন রাসু নেই, যে কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুতো সেখানাও নেই। গোয়ালে দেখেন বলদজোড়াও নেই।

আমাকে উঠিয়ে বললেন, হ্যাঁরে, নীলে, রাসু গেল কোথায় জানিস?

আমার তখন বিয়ে হয়নি, সত্য আর আমি এক ঘরে শুই। আমি উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললাম, তা কি জানি? মাঠের দিকে গেল না তো?

—এত ভোরে সে কোনদিন মাঠে যায় না, আজ গেল কেন? বড় গরুজোড়াও তো দেখচি নে।

—গরুকে কি মাঠে খাওয়াতে নিয়ে গেল?

—এত সকালে আর এই শীতে? কখনো তো যায় না।

—তাইতো। দাঁড়াও উঠি আগে।

বহু খোঁজাখুঁজি করা হ'ল সারাদিন ধরে।

রাসু হাড়ি না-পাত্তা। নির্ঘাত ভেগেছে গরুজোড়া নিয়ে। অমন গরুজোড়া!

সত্য তো পাগলের মত হয়ে গেল। ওর গায়ে খুব জোর, খুব সাহসী আর তেজী ছোকরা। বললে, দাদা, চল, ওর বাড়ী সেই বেলডাঙ্গা যাবো।

—কে যাবে?

—তুমি আর আমি।

—জানিস ওর বাড়ীর ঠিকানা?

—বেলডাঙ্গা থানা, মাঠডা-বেনাদহ গ্রাম। ও দুবার চিঠি পাঠিয়েচে ওই ঠিকানায়।

—ডাকঘর?

—ওই বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ।

—বাবাঃ, সে কদ্দুর এখেন থেকে! ও থাকগে।

সত্য কিছুতেই শুনলো না। তার পীড়াপীড়িতে দুই ভাই পুঁটুলি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। বত্রিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে।

সোজা গিয়ে বেলডাঙ্গা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠডা-বেনাদহ এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে। বেলডাঙ্গার থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে সব খুলে বললাম। তাঁর নাম পঞ্চানন রায়, বাড়ী হুগলী জেলা। আমাদের মুখে সব শুনে তাঁর দয়া হ'ল। আমাদের বললেন, সেখানে কিছুদিন থাকতে, অন্ততঃ এক সপ্তাহ। সাধারণ পোশাকে তিনি দু'জন কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে নিজে বেনাদহ গ্রামে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন, সে বাড়ী নেই।

আমাদের বললেন, থানায় রাত্রে শুয়ে থাকবেন, কোন অসুবিধে হবে না। রেঁধে খেতে পারেন। কিম্বা যদি না রেঁধে খেতে চান, আমার এক ছত্রি কনস্টেবল আছে—

সত্য বললে, কিছু না দারোগাবাবু, আমরা রান্না করেই নেবো।

থানার উত্তরে বড় এক পুকুর, পুকুরের পাড়ে উলুটি বাচড়া ও তাল গাছ। আমাদের যশোরের ভাষায় উলুটি বাচড়া বলে উলুঘাসে ঢাকা মাঠকে। দেখে সত্য খুব খুশী। বলে, দাদা ওই তাল গাছের তলায় আধ-ছায়া আধ-রৌদ্রে বসে রাঁধবো।

দিন কয়েক সেখানে থাকা হ'ল, বেনাদহ গিয়ে রাসু হাড়ির সন্ধান সব সময় নেওয়া হচ্ছে। কখনো রাত দুপুরে, কখনো দিন দুপুরে, কখনো খুব ভোর বেলায়। গাঁয়ের লোকে বলে সে যশোর জেলায় ব্রাহ্মণদের বাড়ী চাকরি করে। এখানে থাকে না তো। আজ এক বছরের মধ্যে তাকে গাঁয়ে দেখা যায় নি।

সুতরাং সাত দিন পরে আমরা রাসু হাড়িকে অপ্রকট অবস্থায় রেখেই বেলডাঙ্গা থেকে রওনা হলাম বাড়ীর দিকে।

সত্য বললে, দাদা পয়সা নেই হাতে, তা ছাড়া রাস্তা দেখে যেতে হবে। যদি এমন হয় পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে বাড়ীর দিকে আসচে। চলো হেঁটে বাড়ী ফিরি।

—সে কি রে, এখান থেকে যশোর জেলা, পথটি যে সোজা নয়। পারবি হাঁটতে?

—গরুজোড়া ফেরত পাওয়ার জন্যে সব করতে পারি দাদা। আমার গাড়ী চালানো একদম বন্ধ হয়ে গেল ওই গরুজোড়ার অভাবে।

অতএব নামলাম দুই ভাই পথে।

বেলডাঙ্গার বাজার থেকে চালডাল কিনে নিই। হাঁড়ি-সরা কিনে বোঁচকায় বেঁধে নিলাম। প্রথম দিন রাস্তার ধারে এক আমতলায় রান্না করে খেলাম। বেশ লাগে কিন্তু এভাবে পথ চলতে। ঘর থেকে কখনো বেরুই নি, এতদূরেও জীবনে কখনো আসি নি, রাসু হাড়ির দৌলতে অনেক দেশ দেখলাম।

সত্য বললে, দাদা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে কাজ নেই। বড্ড দাম হাঁড়ির। ধুয়ে নিয়ে আসি পুকুর থেকে, বোঁচকায় বেঁধে নিই। নইলে কত পয়সা লেগে যাবে রোজ হাঁড়ি কিনতে।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয় নেবার জন্যে একটা কি গ্রামে ঢুকে সামনের একটা বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীর লোকেরা ঘুঁটে আগুন পোয়াচ্চে উঠোনে। আমাদের কথা শুনে বলল, এখানে জায়গা হবে না। আমাদের তাই থাকবার জায়গা নেই। এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে দ্যাখো গে।

কিছুদূর গিয়ে আর একটি বাড়ী পেলাম রাস্তার বাঁ-ধারে। বাড়ীর সামনে গোয়ালঘর, প্রথম শীতে লাউ গাছে মাচাভরা লাউ ঝুলচে। মেটেঘর দু'তিনখানা, উঠোনের পেছন দিকে এক ঝাড় তলদা বাঁশ। বুড়ো-মত একটা লোক তামাক খাচ্ছিল দাওয়ায় বসে। আমাদের দেখে বললে—কে তোমরা?

আমি বললাম, পথ-চলতি লোক।

—এখানে কি মনে করে?

—একটু থাকবার জায়গা দ্যাও কর্তা। অনেক দূর থেকে আসচি, বড় কষ্ট হয়েচে।

—তোমরা?

—আমরা ব্রাহ্মণ।

—গিয়েছিলে কোথায়?

তখন সব কথা খুলে ওকে বললাম। রাসু হাড়ির আনুপূর্বিক ঘটনা। লোকটা নির্বিকার ভাবে তামাক টানতে টানতে সব শুনল। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেলে হুঁকোয় শেষ টান দিয়ে পিচ করে থুতু ফেলে শান্ত ও ধীরভাবে বললে, এখানে থাকার অসুবিধে। আগে দ্যাখো—

এই দাওয়াটায় না হয় শুয়ে থাকবো। এই শীতে—

—এখানে সুবিধে হবে না।

সত্য বললে, এগিয়ে চলো দাদা। এখানে দরকার নেই।

কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা বাড়ীর পেছন দিকটাতে পৌঁছলাম। বাড়ীর মধ্যে মুড়ি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে এবং খোলা হাঁড়িতে মুড়ি ভাজার চড়বড় শব্দ হচ্চে। আমরা ঘরে গিয়ে বাড়ীর উঠানে ঢুকলাম। একটা কালোমত বেঁটে লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে কটমট করে চেয়ে বললে, কে তোমরা? কি চাই?

—আমরা বিদেশী পথিক, বেলডাঙ্গা থেকে আসচি। একটু থাকবার জায়গা হবে রাত্তিরে?

—কি জাত তোমরা?

—ব্রাহ্মণ। আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে, নিজেরা রেঁধে খাবো।

লোকটা যেন একটু নরম হয়ে বললে, দাঁড়াও জিগ্যেস করে আসি।

বাড়ীর মধ্যে থেকে এবার বেরিয়ে এল একটি মেয়েমানুষ, কালো, ঢেঙা, হাতে কুঁচি-কাঠি। ইনিই মুড়ি ভাজছিলেন তা হ'লে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে, কে গা তোমরা?

—আমরা ব্রাহ্মণ, একটু থাকবার জায়গা চাই।

—এখানে জায়গা হবে না। আগে দ্যাখো।

—আগে কোথায় দেখবো?

—ওমা, তোমরা জানো না নাকি? আগে কত লোক আছে—দ্যাখো গে যাও।

—আমরা নতুন লোক। কি ক'রে জানবো লোক আছে কি না।

—সামনে এগিয়ে দেখ না।

—জায়গা একটু হবে না? আমরা নিজেরা রেঁধে খেতাম।

—বার বার বলছি হবে না, তুমি বাপু কি রকম লোক?

বলেই মেয়েমানুষটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে একপাক ঘুরে চলে গেল বিরক্তভাবে।

সত্য বললে—দাদা উপায়? কেউ তো জায়গা দেয় না দেখচি। রাত বেশ হ'ল।

—চ'ল দেখি এগিয়ে?

—আমাদের কি চোর-ডাকাত ভাবচে নাকি?

—কি ক'রে বলবো, চল দেখি এগিয়ে।

এবার একটা পাকা দালান-বাড়ীর বাইরের রোয়াকে আমরা ক্লান্তভাবে এসে বসে পড়লাম বোঁচকা নামিয়ে। অনেকক্ষণ পরে একজন লোক বাড়ী থেকে বের হয়ে কোথায় যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে, আমাদের দেখে বিস্ময়ের ভাবে বললে—কে তোমরা?

আমি বললাম—একটুখানি শুয়ে থাকবার জায়গা দেবেন রাত্তিরে? আমরা ব্রাহ্মণ, বাড়ী যশোর জেলা, বেলডাঙ্গা থেকে আসচি।

—হেঁটে আসচো?

—হ্যাঁ।

—তা থাকো শুয়ে।

ব্যাস, এই পর্যন্ত। বললে না উঠে বৈঠকখানার মধ্যে গিয়ে শোও, কিম্বা তোমরা খাবে কি, কিছু না। সেই যে গেল, আর তাকে দেখলামও না। আর কোন খোঁজখবরও ও নিলে না আমাদের।

সেই শীতের রাত্রে খোলা রোয়াকে কাপড় পেতে দুই ভাই শুয়ে রইলাম—কি করি!

সত্য বললে—রাসু হাড়ির সঙ্গে একবার দেখা হ'ত, তার মুণ্ডুটা ভেঙে দিতাম এক ঘুষিতে।

সত্য বেশ জোয়ান ছোকরা, খেতেও পারতো অসম্ভব। একসের রান্না-করা মাংস আর আধসের চালের ভাত একা খেতে পারতো।

বেলডাঙার বাজারে সস্তা ডিম দেখে ও বলতো—দাদা, রোজ চারটে ডিম এক একবারে ভাতে দিও আমার জন্যে। খুব করে ডিম খেয়ে নিই।

আরও বেশী করে তার কথা মনে পড়চে কারণ—

কিন্তু থাক সে সব এখন।

আরও একদিন কাটল পথে।

বেথুয়াডহরি ছাড়ালাম। আরও এগিয়ে যাই দুজনে। জগদানন্দপুর বলে গ্রামের হাটে বড় একটা মাছ কিনলাম, বেলা দশটার পরে। খিদেও পেয়েচে বেশ। একটা বড় পুকুরের ধারে আম গাছের

ছায়ায় সত্য উনুন খুঁড়তে লাগলো, আমি মাছ কুটবার ছাই কি ক'রে জোগাড় করি তাই ভাবচি, এমন সময় সত্য বললে—ওই দ্যাখো দাদা—

যা দেখলাম তা এখনো মনে আছে। আজ এই চোদ্দ পনেরো বছর পরেও—

একটি সুন্দরী বৌ গামছা কাঁধে নিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে পথের অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থমকে। আমরা রান্না করতে বসেছি পথের ধারেই। এই পথটা নিশ্চয়ই পুকুরঘাটে যাওয়ার পথ। বৌটি অপরিচিত লোকদের দেখে ঘাটে যেতে পারচেন না। ভদ্রলোকের মেয়েদের স্নানের ঘাটে যাবার পথের ধারে আমাদের রান্না করতে বসা উচিত হয় নি।

সত্য বললে—দাদা, ঘাটের পথে বসেচি, কি করি, উঠে যাবো?

হঠাৎ দেখি বৌটি যেন আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ফিরে গেলেন। অমন রূপসী বৌ এমন পাড়াগাঁয়ে দেখবো আশা করি নি। আমাদের ভয়ও হ'ল। সত্য বললে—যাঃ, ফিরে চলে গেল বৌটি। আমরা না বুঝে অন্যায় করে ফেলেচি—চলো সরে যাই।

পরক্ষণেই ভয়ের সুরে বললে—দাদা লোক আসচে এদিকে, বৌটি গিয়ে বাড়ীতে বলে দিয়েচে—চলো পালাই—মারবে—

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম—কেন পালাতে হবে কেন? কি করেচি আমরা? মার বুঝি সস্তা?

দুটি ছোকরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো,—আপনারা আসচেন কোথা থেকে?

আমি বললাম, বেলডাঙ্গা।

—যাবেন কোথায়?

—যশোর জেলা।

—আপনারা ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু মনে করবেন না। আমাদের খুড়ীমা (আমরা ভাবচি, এই রে! এইবার আসল কথা বলবে) এসেছিলেন ঘাটে নাইতে। তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, দুটি ব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের বাড়ীর সামনে উনুন খুঁড়ে রেঁধে খেতে যাচ্চে এই দুপুর বেলা। ওঁদের গিয়ে বাড়ীতে ডেকে আনো। তা আপনারা দয়া ক'রে চলুন আমাদের ওখানে। আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্চি।

আমরা তো অবাক। এমন কথা বিদেশে কখনো শুনি নি। লোকে একটু শোবার জায়গাই দিতে চায় না, আর কি না রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছে। সত্য বললে, ও দাদা।

—কি?

—যাবে নাকি?

ছোকরা দুটি বলে—যেতেই হবে। খুড়ীমা নইলে ছাড়বেন না। আমাদের হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে আপনাদের। নে বলাই, ওঁদের বোঁচকা দুটো তোল—

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, সত্য আর আমি। আমাদের কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলে না ওরা, নিয়েই গেল। একতালা কোঠা বাড়ী, বাড়ীর উঠানে ডান দিকে দুটো বড় গোলা, তার পাশেই গোয়াল

বাড়ী, সামনে ছোট বৈঠকখানা। আমরা বাড়ীর উঠানে পা দিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্লেন—আসুন আসুন—আপনারা ব্রাহ্মণের ছেলে, এই দুপুর বেলা বাড়ীর সামনে রেঁধে খাবেন, এ কখনো হয়? বড় বৌমা দেখে এসে বললেন, ওঁদের নিয়ে এসো বাড়ীতে। আসুন, বসুন—

আমরা তত লেখাপড়া জানিনে, চাষবাস করে খাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের মিশতে ভয় হয়। বিশেষ করে তো সত্যর। সে গরুর গাড়ী চালায়, সে বললে—দাদা, এগিয়ে যাও—

এগিয়ে গেলাম আমিই।

ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। পা ধোয়ার জল এনে দিলে। তারপর এল চা আর জলখাবার। ফলমূল আর ঘরের তৈরী ক্ষীরের সন্দেশ; নারকেল নাড়ু।

কর্তার নাম হরিচরণ সেন; ওঁরা জাতে বৈদ্য। আমাকে বললেন—রান্না অবিশ্যি আপনাদেরই করতে হবে। স্নান করে নিন আগে।

সত্য বললে, তুমি রান্না কর গিয়ে দাদা। ওঁদের বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘর, আমার লজ্জা করে—

স্নান সেরে অগত্যা আমাকেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে।

সেই সুন্দরী বৌটি দেখি সেখানে উপস্থিত। মুখের ঘুমটা খুলেছেন। সুন্দর মুখ। তেমনি কাঁচা হলুদের মত রং। আমার দিদির বয়সী হবেন, আমার ইচ্ছে হতে লাগলো প্রণাম করবার। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, ওঁরা বৈদ্য, কি মনে করবেন।

আমি বললাম, দিদি, আপনার বড় দয়া।

দিদি মুখের ঘোমটা আরও খুলে বললেন, দয়া কিসের? ওকথা বললে আমাদের পাপ হয় না? বলতে আছে? ছিঃ—

—না বলেও তো পারছি নে দিদি।

—না, বলতে হবে না। রান্না করতে জানেন?

আমি হেসে বললাম, পারি নে তো ক'রে খাচ্ছি কি ক'রে, হ্যাঁ দিদি? আমার ভাই বাইরে বসে আছে, সে আরও ভালো রান্না করতে পারে।

—কই তিনি বাইরে বসে আছেন কেন? ডেকে আনুন গিয়ে, দেখি কেমন রাঁধেন।

—সে আসবে না, বড় লাজুক।

—আপনার ছোট?

—পাঁচ সাত বছরের ছোট।

—ডেকে আনুন। আমি রান্নার জিনিসপত্তর আনি। ডাল রান্না করতে পারবেন তো?

—খুব।

জিনিসপত্র যা তিনি আনলেন, তা অনেক রকম। চাল, ডাল, ঘি, দুধ, আলু, বেগুন, কইমাছ। বললেন, সরুন, আমি কুটে বেছে দিই। ভালো কথা, আপনারা যে মাছ কিনেছিলেন, সে মাছটা ভালো না, পচা। সেটা কুটে ঝাল দিয়ে রান্না করতে দিয়েছি। ও মাছ আপনাদের খেতে দেবো না। বিদেশী লোক, পচা মাছ খেয়ে অসুখ-বিসুখে পড়বেন শেষকালটাতে। সে হবে না বাপু।

—একদম পচা? আমি কিনি নি, সত্য কিনেচে।

—ছেলেমানুষ, ঠকেছে। কই তাকে ডাকুন না।

—সে আসবে না দিদি। সে থাকুক বসে বাইরে। বড্ড লাজুক। ঘেমে উঠবে এখানে এসে। তাছাড়া, আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যসুখ্য বামুন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে মিশতে আমাদের লজ্জা হয়। আপনাকে দিদির মতো দেখছি বলে কোনো লজ্জা হচ্ছে না, কিন্তু অন্য জায়গা হোলে—

—সে কথা থাক। আপনি কি রকম রাঁধেন দেখবো—মাছের ঝোলে কি বাটনা দিতে হবে বলুন তো?

—জানি নে। কখনো তো রাঁধি নি।

—বিদ্যে বুঝেচি। আচ্ছা, আমি সব বলে দিচ্চি, আপনি রেঁধে যান। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েচে আপনাদের।

দু'ঘণ্টা ধরে তিনি বসে বসে আমাকে দিয়ে রাঁধালেন। কখন মাছ ভাজতে হবে, কখন কি বাটনা কিসে দিতে হবে, সাঁতলাবার সময় কি ফোড়ন দিতে হবে। দুধ নিয়ে এলেন প্রায় দেড়সের। পায়েস করতে হবে নাকি। আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম—আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

তিনি বললেন—তা ভালো, থাক, খিদেও পেয়েছে আপনাদের, বুঝতে পারচি। ওবেলা হবে।

আমি একটু আধটু গান করতে পারতাম। বিকাল বেলা আমার সে বিদ্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো আমার ভাইয়ের মুখ থেকে। সন্ধ্যার পরে এল হারমোনিয়ম ও ডুগি-তবলা। আমার গান শুনে অনেকে সুখ্যাতি করতো তখন। গান ভালই গাইতাম। রাত্রে রান্না করবার সময় দিদি বললেন—আপনি এমন চমৎকার গান গাইতে পারেন ভাইটি?

সলজ্জ সুরে বললাম, কি এমন গান?

—আপনাকে এখন ছাড়চি নে। থাকুন দিন কতক এখানে। রোজ গান শুনবো।

—সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু দিদি আমার যে থাকবার জো নেই, পড়ে গিয়েছি এক ফেরে।

—কি ফের?

আমি রাসু হাড়ির গরু চুরির বৃত্তান্ত আগাগোড়া বললাম।

দিদি সব শুনে গালে হাতে দিয়ে কি চমৎকার সুশ্রী ভঙ্গী ক'রে বললেন, ওমা আমি যাবো কোথায়!

সুন্দরী মেয়ে, কি অপুর্ব সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওই মুহূর্তটিতে!

বললাম—আপনি তো দেবীর মত। কেউ জায়গা দিতে চায় না বিদেশী দেখে। তিন রাত কি কষ্ট পেয়েছি দিদি! আপনার মত মানুষ ক'জন, যে রাস্তা থেকে লোক ধরে বাড়ী নিয়ে এসে খাওয়ায়? আপনি বুঝতে পারবেন না মানুষ কত দুষ্ট হতে পারে।

দিদি হেসে বললেন—আমার একটা সাধ ছিল—আপনি দিদি বলে ডেকে সে সাধ আমার পূরতে দিলেন কই?

—কেন? কি সাধ?

—জানেন, আমার অনেক দিনের সাধ ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের বাড়ী আসবেন, আমি তাঁর পা ধুয়ে দেবো নিজের হাতে—কিন্তু আপনার বেলা তা করতে পারলাম না। দিদি বলে ডাকলেন।

—সে আমাদের মত ব্রাহ্মণ নয় দিদি। আমরা চাষবাস ক'রে খাই। লেখাপড়া জানিনে। আমাদের কথা বাদ দিন।

—তাতে আমার কি? আপনি কি করেন আমাদের দেখবার দরকার কি? যাক গে। এখন বলুন ক'দিন থাকতে পারবেন?

—কালই যাবো।

—কাল যাবার কথা ভুলতে হচ্চে। পরশু বিবেচনা করে দেখা যাবে। এখন বলুন তো, মাংস খান তো?

—খাই।

—শুনুন, কাল রাত্রে লুচি মাংস করবো। লুচি আমি ভাজবো, তাতে কোনো দোষ নেই—আপনি শুধু মাংসটা রেঁধে নেবেন।

—আপনি যখন দিদি, মাংস রাঁধলেনই বা—

—সে হবে না। ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাওয়াতে পারবো না এ বাড়ীতে—

—বড্ড সেকেলে আপনি। ঠাকুমা দিদিমাদের মত সেকেলে। বলুন ঠিক কি না?

দিদি শুধু হাসলেন, কথার উত্তর দিলেন না।

পরদিনও পরম যত্নে-আদরে কাটলো ওঁদের বাড়ী। সন্ধ্যার আগেই গানের ব্যবস্থা হ'ল। বাড়ীর মেয়েরা আড়াল থেকে গান শুনলেন। আমি অনেকগুলো গান গাইলাম। রান্নাঘরে যেতেই দেখি দিদি গরম চা নিয়ে বসে আছেন। বললেন—বড্ড পরিশ্রম হয়েচে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মাংসটা চড়িয়ে দিন। মেখে চুকে ঠিক ক'রে রেখেচি। কষে নিন আগে। শুনুন, পেঁয়াজ দিই নি কিন্তু।

—কেন, আপনাদের পেঁয়াজ চলে না

—আমাদের চলে। আপনাদের চলবে কি না—

—খুব চলে। দিন পেঁয়াজ বাটা—

—কি সুন্দর গান গাইলেন আপনি! সত্যিই চাষবাস করেন?

—সত্যি। গান গাইলে চাষবাস করা যায় না, হ্যাঁ দিদি?

দিদি হেসে চুপ করে রইলেন। অনেক সময় কথার উত্তর না দেওয়া ওঁর একটা স্বভাব।

পরদিন সকালেই আমরা দু'জন ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম।

দিদি ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে আর সত্যকে বসিয়ে শসাকাটা, কলা, শাঁকআলু, ক্ষীরের ছাঁচ ইত্যাদি রেকাবিতে সাজিয়ে সামনে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে সত্যি জল এল আমার। বার বার বলে দিলেন—আবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি! বেলুর বিয়ে হবে বোশেখ মাসে, সেসময় চিঠি যাবে। ভুলবেন না দিদির কথা।

আসবার সময় কর্তাকে বললাম—দিদির মত মানুষ দেখিনি কর্তামশায়—

বৃদ্ধ বললেন—বড় বৌমা তো? এ বাড়ীর লক্ষ্মী। ওঁর থেকেই সংসারের উন্নতি। উনি আসার পর থেকে সংসার যেন উথলে পড়লো। আর মা'র আমার কি দয়া! পাড়ার কেউ অভুক্ত থাকবে না। সব খবর নিজে নেবেন। দু'তিনটি স্কুলের ছেলেকে মাইনে দিচ্ছেন এই পাড়ার। যে এসে ধরবে, 'না' বলতে জানেন না। মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। রূপে গুণে লক্ষ্মী।

ভুলি নি তাঁর কথা।

আজ চোদ্দ বছর হয়ে গেল। এখনো মনে জ্বল জ্বল করচে সে মূর্তি।

আর সেখানে যাওয়া হয় নি। কোন খোঁজখবরও নেওয়া হয় নি।

আজ কেন একথা মনে উঠলো এতদিন পরে, বলি সে উপসংহারটি।

দিন পাঁচ-ছয় আগে আমার ভগ্নিপতি মনোমোহন রায় দফাদার সেই রাসু হাড়িকে গ্রেপ্তার ক'রে বিকেলবেলা আমার বাড়ীতে নিয়ে হাজির। রাসু হাড়ি জয়দিয়ার বাঁওড়ের ধারে শূওরের পাল চরাচ্ছিল —এখান থেকে এগার মাইল দূরে। মনোমোহন থানায় হাজিরা দিতে যায় রোজ বৃহস্পতিবারে এই পথ দিয়ে। রাসু হাড়িকে দেখে চিনতে পেরেচে এবং চৌকিদার দিয়ে তক্ষুনি গ্রেপ্তার করিয়ে আমার এখানে নিয়ে এসেছে। রাসু এসে বসে চারিদিকে চেয়ে বললে—এ:, বাবুদের বাড়ী এ কি হয়ে গিয়েচে? চণ্ডীমণ্ডপ নেই, গোলা নেই—কোঠা ভেঙ্গে গিয়েচে। লাঙ্গল-গরুও নেই দেখচি।

আমার মাকে দেখে বললে—মা ঠাকরুন এত বুড়ো হয়ে গিয়েচেন? আপনাকে যে আর চেনাই যায় না। ছোটবাবু কই?

মা বললেন—সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে আজ আট বছর—সে চলে যাওয়াতেই তো সংসার একেবারে গেল। কিছু নেই আর সে সংসারের।

আমি বললাম—রাসু, গরুজোড়া চুরি করিছিলি তুই?

রাসুও বুড়ো হয়ে পড়েচে। মাথার চুল বিশেষ কাঁচা নেই। গোঁপ সম্পূর্ণ পাকা। একটু কুঁজোমত হয়ে পড়েচে।

একটু চুপ করে থেকে বললে—হ্যাঁ বাবু। মিথ্যে বলে আর কি হবে? গরু নিয়ে গিয়ে একটা গাঁয়ের হাটে বিক্রি করি।

—দেশে যাস নি?

—না বাবু, সেই টাকা নিয়ে সোজা রাজসাহী চলে যাই। ভয়ে দেশে ফিরি নি।

—কেন চুরি করলি?

—অদেষ্ট বাবু। সবই অদেষ্টের লিখন। তখন বয়েস কাঁচা ছিল, বুদ্ধি ছিল না। দুঃখু তো ঘুচলো না, সব রকমই ক'রে দেখলাম, বাবু। এখন রাতুলপুরের হিঙ্গল সর্দারের শূওর চরাই। ষোল টাকা মাইনে আর খাতি দ্যায়। বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কনে যাব এ বয়েসে—চকি ভালো দেখতি পাইনে—

মা বললেন—রাসু দুটো খাবি? হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে ওবেলার। দুটো খা—বোধ হয় আজ তোর খাওয়া হয় নি?

জগদানন্দপুরের সেই দিদির কথা অনেকদিন পরে আবার মনে এল। ভুলেই গিয়েছিলাম বটে। এখন মা'র ওই কথায় জগদানন্দপুরে দিদির সেই দেবীর মত মূর্তিখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভুলি নি দেখলাম, এতটুকু ভুলি নি। বাইরে ভুলেছিলাম মাত্র। কি জানি, এতদিন পরে বেঁচে আছেন কি না।

মনোমোহনকে বললাম—ভায়া, আর চোদ্দ বছর পরে ওকে গ্রেপ্তার করে কি করবে? ছেড়ে দাও ওকে। এখন ও যেমন গরীব, আমিও তেমনি গরীব। ওকে জেলে দিয়ে আমার কি আর দুঃখু ঘুচবে?

রাসু হাড়ি কেঁদে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আয় বাবা রাসু, ভাত দিইগে—রান্নাঘরের উঠোনে চল—তোমারও অদেষ্ট—আমাদেরও অদেষ্ট—চল বাবা—

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

সাহেবের নাম এন. এ. ফারমুর। নীলগঞ্জের নীল কুঠীয়াল সাহেবদের বর্তমান বংশধর। আমি বাল্যকাল হইতেই সাহেবকে চিনি। যখন স্কুলে পড়ি, সাহেবদের কুঠীতে একবার বেড়াইতে যাই। ফারমুর সাহেবকে এদেশের লোক ফালমন সাহেব বলিয়া ডাকে। আমার বাল্যকালে ফালমন সাহেবের বয়স ছিল কত? পঞ্চাশ হইবে মনে হয়। সাহেবদের কুঠীতে যাইয়া দেখিতাম সাহেব দুধ দোয়াইতেছেন। অনেকগুলি বড় বড় গাই ছিল কুঠীতে, বিশ ত্রিশ সের দুধ হইত। নৌকা করিয়া প্রতিদিন ওই দুধ মহকুমার শহরে প্রেরিত হইত। আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমাকে দেখিয়া বলিতেন—সকাল-বেলাতেই এসে জুটলে? খাবা কিছু?

—খাবো।

—কি খাবা? দুধ?

—যা দেবেন।

—ও মতি, ছেলেটিকে গুড় দিয়ে মুড়ি দাও আর দু'উড়কি দুধ দাও। —আমি এই মাত্তর খেয়ে আলাম—বোসো খোকা, বোসো।

নীলকুঠীর আমলে ফালমন সাহেবের বাবা লালমন (লালমুর) সাহেবের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এদেশে। নীল চাষ উঠিয়া যাইবার পরে বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হইয়া এ দেশেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে জমিদারীও চলিয়া যায় অনেক, লালমন সাহেবও মারা যান। ফালমন বিস্তৃত আউশ ও আমন ধানের জমি চাষ করিতে থাকেন, বড় বড় গরু পুষিতেন, সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ভেড়া। সাহেবের কুঠীতে সারি সারি ধানের গোলা ছিল বিশ ত্রিশটা। জমিদারীও ছিল, কুঠীর পূবদিকের বড় হলদে ঘরে (যার সামনে বেগুনি প্যাটেনফুলের প্রকাণ্ড গাছ, কি ফুল জানি না, আমরা বলিতাম 'প্যাটেন' ফুল) কুঠীয়াল সাহেবের নায়েব ষড়ানন বকসি কাছারি করিতেন, এবং প্রজাপত্র ঠেঙ্গাইতেন। লালমন সাহেব কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, তবে তাঁহার বৈঠকখানায় একখানা বড় ছবির তলায় লেখা ছিল "T. Farmour of Bournemouth, England." ফালমনের জন্ম নীলগঞ্জেই। তাঁহাদের সকলেই যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ের কৃষক শ্রেণীর ভাষায় কথা বলিতেন।

—কি পড়ো?

—মাইনর, সেকেন ক্লাসে।

—ইউ, পি, পাশ করেচ?

—হ্যাঁ।

—বিত্তি পেয়েছিলে?

—না।

—আমার ইস্কুলে পড়ো?

—আপনার ইস্কুলে না। জেলাবোর্ডের স্কুলে, চেতলমারির হাটতলায়।

—ও বুঝিচি। তবে তোমার বাড়ী এখানে না?

—আজ্ঞে না। আমার পিসির বাড়ী এখানে।

—কেডা তোমার পিসে?

—৺ভূষণচন্দ্র মজুমদার।

—আরে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী এসেচ তুমি? বেশ বেশ, নাম কি?

—শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী।

—পিতার নাম?

—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

—তুমি মাখনলাল মাস্টারের ছেলে? চেতলমারির ইস্কুলির?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই বলো। মাখন মাস্টার তো আমাদের বন্ধু লোক। বেশ, বসো, দুধ দিয়ে মুড়ির ফলার ক'রে খাও।

ফালমন সাহেবের সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ শুরু। তা' বাদে মাঝে মাঝে সাহেবকে চিতলমারির খড়ের মাঠে আমীনকে সঙ্গে লইয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। কতদিন নৌকায় লোকের সাহায্যে পটল কুমড়া বোঝাই করিতে দেখিয়াছি। লম্বা একহারা সাহেবী চেহারা। ভুঁড়ি একদম নাই, গায়ে এক আউন্স চর্বি নাই কোথাও। গোঁফ জোড়াটা বড্ড লম্বা, দৃঢ় চোয়াল সবই ঠিক সাহেবী ধরনের। কিন্তু পোশাকটা সব সময় সাহেবের মত নয়, কখনো ধুতি, কখনো কোটপ্যাণ্টের উপর মাথায় তালপাতার টোকা। শেষোক্ত বেশটা দেখা যাইত যখন ফালমন মাঠের চাষবাসের তদারক করিতেন। কৃষাণ ছিল সংখ্যায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, লাঙ্গল গরু চল্লিশখানা, আট দশখানা গরুর গাড়ী। অত বড় ফলাও চাষ সাধারণ কোনো বাঙালী গৃহস্থ চাষী কল্পনাও করিতে পারে না। তালপাতার টোকা মাথায় কৃষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করিতেন বটে, কিন্তু হুঁকোয় তামাক খাইতে কখনো দেখি নাই—পাইপ সর্বদা মুখে লাগিয়াই থাকিত। কৃষাণদের বলিতেন—বাবলাতলার জমিগুলোনতে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মণ্ডল? তা দ্যাও। আর দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেধে যাবে আনে। তখন লাঙ্গল বেশী লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে।

সোনাই মণ্ডল হয়তো বলিল—বাবলাতলার ভুঁইতে পানি আর কনে, সাহেব? কে বল্লে আপনারে?

—নেই? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট (সাহেবের শালা, এখানেই বরাবর থাকিত দেখিতাম, চাষবাসের কাজে দেখে) যাইনি বুঝি? ঝা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার।

—এখনো দানা পুরুষ্ট হয়নি, আর চার পাঁচটে রোদ খাক। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

এই সময় নদীপপুরের গোপেশ্বর বৈরাগীকে মাঠের পাশের পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া মাথার টোকাটা কপালের উপর দুই আঙ্গুল দিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিলেন—ও গোপেশ্বর—শোনো —ও গোপেশ্বর—

গোপেশ্বর আসিয়া বলিল—সেলাম সায়েব—

সাহেবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এ অঞ্চলে, কারণ অধিকাংশই তাহার প্রজা।

—যাচ্চ কনে?

—যাবো একবার পানচিতে। মেয়ের খবর পাইনি অনেক দিন। জামাইডা কেমন আছে দেখে আসি, পেট জোড়া পিলে তার। গত অঘ্রান মাসে যায় যায় হইছিল—

—ম্যালেরিয়া?

—তা আমরা কি বুঝি? তাই হবে।

—বেশ। একটা কৃষ্ট বিষয় গান করে শুনিয়ে দাও দিকি?

—কৃষ্ট বিষয়?

—কিংবা শ্যামা বিষয়। না, তুমি বোষ্টম টুম টুম আবার বুঝি শ্যামা বিষয় গাইবা না। ঝা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ পড়েচে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বোসো, এই পিটুলিতলায় ছাওয়া পানে।

গোপেশ্বর গান গাহিতে বসিয়া দুবার কাশিল, সাহেবের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে দু'একবার চাহিয়া পরে গান আরম্ভ করিল—

কোনটি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে—

ফালমন সাহেব হাতে তালি দিতে দিতে বলিলেন,—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশুরায় না নীলকণ্ঠ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশুরায় একখানা হোক না?

সাহেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এ অঞ্চলে, সুতরাং গোপশ্বেরকে আর একখানা গান গাহিতেই হইল।

ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা।
কূলে বসে দুনয়নে বারি ঝরে
কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাও জানে না।
একবার ভাব যদি বর্তমান কংসের পদে
দৈবে দয়া যদি হোত পাষাণ হৃদে—
তা হয় না আর
গেল একূল ওকূল দুকূল
অকূল পারে গোকুল

কূলের তিলক রাখতে কূল পেলেম না।

ভয়ে আকূল বসুদেব

দেখে অকূল যমুনা—

ফালমন সাহেব চক্ষু মুদিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গান শুনিতেছিলেন। আবার গোপেশ্বরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ—দাশুরায়ের গানের কাছে আর-সব কিছু লাগে না। কি রগম—কি ওরে বলে গোপেশ্বর?

—অনুপ্রাস?

—ওই যা বললে। ভারি চমৎকার, লাগতিই হবে যে। দাশুরায় হুঁঃ—

—আজ উঠি সাহেব।

—আচ্ছা এসো—

ফালমন সাহেবের কাছারি ঘরে—রাম শ্যামকে মারিয়াছে, শ্যামের গরু যদুর পটলের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে—এই সব গ্রাম্য মামলার বিচার হইত। বিচার সাধারণতঃ করিত নায়েব ষড়ানন বকসি, গুরুতর মোকর্দমায় ফালমন সাহেব নিজে বিচারাসনে বসিতেন।

আমি দেখিয়াছিলাম যেদিন গুড়ে জেলের ভাই-বৌ রেমো ধোপার ছেলে অতুলের সঙ্গে সোজা চম্পট দেওয়ার পরে আড়ংঘাটা স্টেশনে ধরা পড়িয়া পুনরায় গ্রামে আনীত হইল, সেদিন ফালমন সাহেবের বিচার। গ্রামে হৈ চৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ দু'দশ বছরে এই ধরনের ব্যাপার কেহ এ অঞ্চলে দেখে নাই, শোনেও নাই।

ফালমন সাহেব অতুলকে কড়া সুরে প্রশ্ন করিলেন—জেলেবৌয়ের বয়সটা কত?

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তা জানিনে সাহেব।

—তোমার চেয়ে বড় না ছোট?

—আমার চেয়ে বড়।

—তোমার বয়েস কত?

—আজ্ঞে, এই তেইশ।

রেমো ধোপার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন—এই রেমো, বয়েস ঠিক বলচে তো?

রেমো বলিল—হাঁ, সাহেব।

—আর জেলে-বৌয়ের বয়েস কত?

গুড়ে জেলে বলিল—আজ্ঞে, বত্রিশ।

—বত্রিশ?

—আজ্ঞে।

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোর বড় দিদির বয়িসী যে-রে হারামজাদা—তোর লঘু-গুরু জ্ঞান নেই? মারো দশ জুতো সকলের সমানে—আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, যাও—

ব্যস, বিচার শেষ।

আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা ওকালতি খাটিবে না।

The great Khan has spoken—মিটিয়া গেল।

সেকালের নীলকুঠীর অটোক্র্যাট ভূম্যধিকারীর রক্ত ছিল ফালমন সাহেবের গায়ে, প্রজা পীড়ন ও শোষণে তিনি তেমনি পটু, তবে যুগপ্রভাবে নখ-দন্ত অপেক্ষাকৃত ভোঁতা—এইমাত্র।

সেবার মস্ত বড় দাঙ্গা বাধিল বাগদী ও জেলে প্রজাদের মাৎলার বিলের দখল লইয়া। মাৎলার বিল বরাবর বাগদী প্রজাদের কাছে বন্দোবস্ত করা ছিল রানী রাসমণি এস্টেটের স্বরূপনগর কাছারী থেকে। কখনো এক পয়সা খাজনা আদায় হইত না। মামলা মোকর্দমা করিয়াও কিছু হয় না—তখন রানী-এস্টেটের নায়েব ভৈরব চক্রবর্তী মাৎলার বিল দশ বৎসরের জন্য ইজারা দিলেন ফালমন সাহেবকে। সেলামি এক পয়সাও নয়, কেবল শালিয়ানা আড়াইশো টাকা খাজনা। কারণ দুর্ধর্ষ জেলে ও বাগদী প্রজাদের কাছ থেকে বিলের দখল পাওয়াই ছিল সমস্যা—সাহেবের দ্বারা সে সমস্যা পূরণ হইবে, ভৈরব চক্রবর্তীর এ আশা ছিল এবং সে আশা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়—বিল ইজারা দেওয়ার এক পক্ষ কালের মধ্যেই পদ্মফোটা মাৎলা বিলের রক্ত-রঞ্জিত জল তাহার প্রমাণ দিল। প্রকাশ ফালমন সাহেব স্বয়ং টোকা মাথায় দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দাঙ্গা পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও পুলিশ রিপোর্টে পরে প্রকাশ হইল, দাঙ্গার সময় ফালমন সাহেব তাঁর বড় মেয়ে মার্জোরির টনসিল অস্ত্র করিবার জন্যে তাহাকে লইয়া কৃষ্ণনগর মিশন হাসপাতালে যান।

মামলাবাজ ও-ধরনের আর একটি লোক সারা জেলা খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

প্রায়ই মহকুমায় মামলা পড়িত।

সাহেবের চারদাঁড়ের ডিঙি সাতটার সময় ছাড়িত কুঠীঘাট থেকে। ছইয়ের মধ্যে ফালমন সাহেব ও তাঁর খাওয়ার জন্য ফলের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, দুধের বোতল, নায়েব ষড়ানন বাবু ও তাঁর বিছানাপত্র, দুজন মাঝি (তার মধ্যে একজনের নাম গোপাল পাইক, জাতে বাগদী খুব ভালো গান গাহিতে পারে) —এই লইয়া তীরবেগে নৌকা ছুটিত দশ মাইল দূরবর্তী মহকুমার শহরের দিকে। হু হু করিয়া মুখোড় বাতাস বহিত। গাঙে সাহেবের প্রিয় অনুচর গোপাল পাইক প্রভুর ইঙ্গিতে নৌকার গলুইয়ের কাছ থেকে ছইয়ের কাছে সরিয়া আসিত। সাহেব বলিতেন—একটা কৃষ্ণ-বিষয় কিংবা শ্যামা-বিষয় গাও গোপাল—

গোপাল অমনি ধরিত—

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা সুশোভিনী
নীল নয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী—

তারপর গাহিত—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, ছাড় যাই নিজ কাজে—

গোপাল পাইক যাত্রাদলে অল্প বয়সে গাহিত, সাহেবের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার আশায় একদিন সে নীলগঞ্জের কুঠীতে গাহিতে আসে—গান শুনিয়া সাহেবের বড় ভাল লাগিল এবং

সেই হইতে গোপাল সাহেবের এস্টেটের চাকুরীতে বহাল হইয়া গেল।

এক পয়সা খাজনা বাকী থাকিলেও যেমন সাহেবের এস্টেট হইতে নালিশ হইত, আবার ধরিয়া পড়িলে ক্ষমা করিতেও ফালমন সাহেব ছিলেন বিশেষ পটু। কতবার এরকম হইয়াছে। দুর্বুদ্ধি প্রজা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কিংবা উকিল-মোক্তারদের উৎসাহে নীলগঞ্জ এস্টেটের বিরুদ্ধে মামলা লড়িয়াছে। একবার ফৌজদারী, তারপর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী দেওয়ানী, মহকুমা হইতে সব-জজকোর্ট, সেখান হইতে আবার পুনর্বিচারের জন্য মহকুমার মুন্সেফকোর্ট—এই করিতে করিতে প্রজা এস্টেটকে হয়রান করিয়া এবং নিজেও সর্বস্বান্ত হইয়া যখন জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিল, তখন হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টের বটতলাতেই একেবারে ফালমন সাহেবের পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল পায়ে।

—আরে কি কি, কে?

—আজ্ঞে আমি মুকুন্দ বিশ্বেস।

সাহেব পায়ের ঝটকা মারিয়া বলিলেন—বেরো হারামজাদা—বেরো—বেরো—

ফালমন হিন্দী কথাই জানিতেন না, খাঁটি বাংলা ইডিয়মযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সে শুধু এইজন্য যে নীলগঞ্জের কুঠীই তাঁহার জন্মস্থান, এই গ্রাম্য আম-জাম নিকুঞ্জ ছায়ার শ্যামলতায় ও কৃষকদের সাহচর্যে তিনি আবাল্য লালিত পালিত ও বর্ধিত। ডরসেট শায়ারের ইংরাজরক্ত ধমনীতে থাকিলেও মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী, ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিন্ত শান্তি ও আলস্যের মধ্যে যাঁহার যৌবন কাটিয়াছে, সেই স্বচ্ছল বাঙালী জমিদার। মুকুন্দ বিশ্বাস ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিতে লোক ছুটিয়া ভিড় বাধাইল। সকলেই ভাবিল সাহেব কি অত্যাচারী! গরীব প্রজাকে কি করিয়া পীড়ন করিতেছে দ্যাখো। একেবারে এইভাবেই সর্বস্বান্ত হয়? ছিঃ—

কেহ বুঝিল না কিরূপ তেদঁড় ও দুঁদে-প্রজা মুকুন্দ কলু।

—কি চাই? কি?

—সাহেব মা বাপ—ধরম বাপ—মোরে বাঁচাও ধরম বাপ—

—কেমন? মোকদ্দমা করবিনে? কর ছানি—শোনছেন ও হরিশ বাবু শোনেন—ই দিকি।

চোগা-চাপকান পরনে বড় উকিল হরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী ঘটনাস্থলের কিছু দূর দিয়া যাইতেছিলেন। সাহেবের আহবানে নিকটে আসিতে আসিতে বলিলেন—গুড মর্ণিং মিঃ ফারমুর, বলি ব্যাপার কি?

—আরে দ্যাখেন না কাণ্ডখানা। চেনেন না মুকুন্দ বিশ্বাসকে? পাচপোতার মুকুন্দ বিশ্বাস। বদমায়েশের নাজির, ওর বদমায়েশী দেখতে দেখতে মাথার চুল আমি পাকিয়ে ফ্যাললাম হরিশবাবু, ওরে আর আমি চিনিনে? শুনুন তবে—আরে নায়েব মশায়, বলুন দিকি সব খুলে—

সব শুনিয়া হরিশবাবু মুকুন্দ কলুকে ধমক দিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! তাহার মত ট্যানাপরা লোকের পক্ষে? যাক, যাহা হইবার হইয়াছে, সাহেব নিজগুণে এবারটি গরীবকে মাপ করিয়া দিন।

সাহেবকে হরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি ডিক্রির দিন?

—নিশ্চয়। ও এতদিন আমার সঙ্গে একটা কথা কইতো না। আজ একেবারে পায়ে ধরেছে।

ষড়ানন বকসি বলিল—শুধু পায়ে ধরা নয় একেবারে মড়াকান্না কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলেছে —

সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—এই, যাও সব এখান থেকে। এখানে কি? চলে যাও সব—

হরিশবাবু উকিলও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তোমরা কেন এখানে বাপু? কাছারির সামনে ভিড় কোরো না—হাকিম চটবেন—যাও এখন—এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

হিসাব করিয়া ষড়ানন বকসি সাহেবকে জানাইল, এই মামলায় এ পর্যন্ত সাতশো সাড়ে-সাতশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা যা, মাপ করলাম। নায়েববাবু মামলা মিটিয়ে নেবেন।

ষড়ানন বকসি বলিল—খরচার টাকা?

—ওর সঙ্গে না হয় ষড় করে নেবেন। তবে বলে দিন আমার কুঠীতে গিয়ে নাকে খত দিতে হবে ওকে। নইলি আমি ওকে ছাড়বো না। ও নাকে খত দিতে রাজী কি না?

মুকুন্দ বিশ্বাস খুব রাজী। সে এখনি নাকে খত দিতে প্রস্তুত আছে। সাহেবের আশ্বাস পাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার শীতকালের মাঝামাঝি মিসেস ফালমন লিভারের অসুখে ভুগিয়া কলিকাতার হাসাপাতালে মারা গেলেন। দিন-সাতেক পরে নীলগঞ্জের চারিপাশের পাঁচ-ছয় খানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের কাছে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল—মেম সাহেবের আত্মার মঙ্গল কামনায় যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা খাইবেন কিনা। তখনকার দিনে এসব ধরনের খাওয়ায় সামাজিক কড়াকড়ি অনেক বেশী ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজী না হইয়া এক্ষেত্রে উপায় ছিল না। সাহেবকে চটাইতে কেহই রাজী নয়।

নীলগঞ্জের কাছারি ঘরের সামনে তুঁততলায় দু'দিন ধরিয়া কালী ময়রা সন্দেশ, বোঁদে, পানতুয়া ভিয়ান করিল। কাছারি বাড়ীর হলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল, এ অঞ্চলে সে রকম খাওয়ানো কখনো কেহ দেখে নাই।

ফালমন সাহেব কুঠীর গেটে নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে বলিতেছিলেন—পেট আপনাদের ভরেছে? কষ্ট দেলাম আপনাদের এনে। কিছু মনে করবেন না—

আমিও সে দলে ছিলাম, তখন স্কুলের বালক, ভূরিভোজন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। দীর্ঘাকৃতি ফালমন সাহেবের সে বিনীত মুখভাব, সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টি এখনো মনে আছে। মানবতার উদার গতিপথের পার্শ্বে অবস্থিত এই ছবিখানি আজকার এই হিংসা দ্বেষ ও সাম্প্রতিক ধর্মমতের দ্বন্দ্বের দিনে বেশী করিয়া স্মরণে উদিত হয়।

বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন সাহেব সকলের সামনে চেয়ার পাতিয়া বসিতেন। যাত্রা গানের অমন ভক্ত দুটি দেখা যাইত না।

—ও বেয়ালাদার, একটা এ'কালে গৎ ধরো বাবা—জুড়িদের এগিয়ে দাও—

সাহেবের ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে যাত্রাদলের গাইয়ে-বাজিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আর কৃষ্ণ সাজিয়া আসিয়া গান ধরিলেই হইল, অমনি মেডেল ঘোষণা।

সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—এই যে ছোঁড়াডা কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রূপোর মেডেল দেবো। কথা শেষ করিয়াই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—হাততালি—হাততালি—

অমনি চটপট করিয়া চতুর্দিকে হাততালি পড়িবে। নিজে সকলের আগে হাততালি দিবেন।

কোন করুণ ভক্তিরসের ব্যাপার ঘটিলে সাহেব সকলের সঙ্গে 'হরিবোল' দিয়া উঠিবেন।

বারোয়ারীতে চাঁদা দিতে সাহেব যেমন মুক্তহস্ত, তেমনি রক্ষাকালীপূজা বা শীতলাপূজার অনুষ্ঠানে। তখনকার দিনে বারোয়ারি দুর্গাপূজা বা শ্যামাপূজার রেওয়াজ ছিল না।

মিসেস ফালমন মারা যাওয়ার পরে নীলগঞ্জের কুঠীর রাঙা 'প্যাটেন' ফুলের গাছ, নদীর ধারের অত বড় বাড়ী, লেবু ও আমের বাগান, পসার প্রতিপত্তি, অর্থসম্পত্তি সব কিছু শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বাড়ীর এক নিম্নজাতীয়া দাসীর সঙ্গে সাহেবের নাম জড়িত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। মার্জোরি ও ডোরা বিবাহ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সাহেবের যে ছেলে বিলাতে পড়িত, সে আর এদেশে আসিলই না। শোনা গেল, ইংলণ্ডেই বিবাহ করিয়া সেখানেই সংসার পাতাইয়া সে ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধির দিকে মন দিয়াছে।

এই সময় নীলগঞ্জের কুঠীতে এক ঘটনা ঘটিল।

বাহির হইতে কে একজন সাহেব আসিয়া কিছুদিন কুঠীতে রহিল। এ সময়ে প্যাটও কুঠী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নবাগত সাহেবের নাম মিঃ মুডি। এ অঞ্চলে তাহাকে ''মুদি সাহেব'' বলিত সবাই। মুদি সাহেব একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইত।

একদিন কি ঘটিয়াছিল কেহ জানে না, গভীর রাত্রে মিঃ ফালমনের সঙ্গে মুদি সাহেবের বচসার শব্দ শোনা গেল। বাহির হইতে চাকরে বাকরে কিছু বুঝিল না। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল, সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে মুদি সাহেবের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ঘরের মেঝেতে লুটাইতেছে এবং ঘরের কোণে সেই নীচ জাতীয়া দাসীটা দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

পুলিশ তদন্ত হইল। কিন্তু মিঃ ফালমনের কিছু হয় নাই, ব্যাপার নীলকুঠীর শক্ত কম্পাউণ্ডের বাহিরে এক পাও গড়ায় নাই।

এই ঘটনার পরেও ফালমন সাহেব অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। একাই থাকিতেন। পুত্র-কন্যা কখনো আসিত না। সাহেবের এক ভাই শোনা যায় ইংলণ্ড হইতে কতবার তাহাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছিল, ফালমন সাহেব বলিতেন—এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় কবর দিও, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবে।

ফালমন সাহেব এদেশেই মাটি মুড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে। নীলগঞ্জের কুঠী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে দিনমানেও বাঘ বুনো-

শূয়োরের ভয়ে কেউ যায় না। কুঠীর নিমতলায় ঘন বুঁচকাঁটায় দুর্ভেদ্য ঝোপের ছায়ায় খুঁজিলে ফালমন সাহেবের কবরের ভগ্নাবশেষ এখনো কৌতূহলী রাখাল বালকদের চোখে পড়ে। আলমপুর পরগণার বড় তরফের দে চৌধুরী জমিদার বাবুরা নীলগঞ্জের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

হিঙের কচুরি

আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ীর একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাড়ীটাতে বাস করত। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করত। চুড়িওয়ালার নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসত, তখন সবাই মিলে ঘড়া কলসী টিন বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি শুরু হত জল ভর্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না। ইতর লোকের মত কাণ্ড এদের! এখান থেকে উঠে যাব শীগগির।

কিন্তু যাওয়া হত না কেন, তা আমি বলতে পারব না। এখন মনে হয় আমরা গরিব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই।

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত, গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তার একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষে মারামারি পর্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ী থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়ীতে বাঁশবাগানের ধারে ধুতরো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আসস্যাওড়ার ডাল আর পাতা যে বয়ে এনেছিল! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেন সত্যিকার বাড়ী একখানা। কালী তাই বলত। একটা ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছিল। ও বলত, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাত-চরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় পাখী ওখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এসব সম্ভব হয়নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়ীতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানা তৈরি করেছিলাম, ময়না গাছের ডালে বাঁধা সেই পাখীর বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখী সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়ীতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনের টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিতে এসেছে, গুড়ের আড়তের সামনে গুড় নামাচ্ছে গরুর গাড়ী থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ীর জানলা থেকে একটি বৌ আমার মত

তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায় অনেক গাড়ী-ঘোড়া যায়। আমাদের গ্রামে কখনও একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখি নি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন-তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে গলির ও মোড়ে কতকগুলো সারবন্দী খোলার বাড়ী আমাদেরই মত। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে,—আয়না, পুতুল, কাঁচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরে যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিগ্যেস করে। তাদের বাড়ী বর্ধমান বলে কোন জায়গা আছে সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আসসিংডি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনও আস নি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করত, কপালে টিপ পরত, মুখে ময়দার মত গুঁড়ো মাখত, চুল বাঁধত—কি চমৎকার মানাত ওকে! কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে থাকতে দিত না, বলত—তুমি এবার বাড়ী যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ী যাও।

আমার অভিমান হত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকব। কি করবে বাবু আমার?

—না না, চলে যাও। তোমার এখন থাকতে নেই। অমন করে না, লক্ষ্মীটি!

—বাবু তোমার কে হয়? ভাই?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ী।

আমার বড় কৌতূহল হত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ী যেতে বলে?

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়।

আমাদের দেশে ও পাতা নেই; সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বলল—এই নাও, খেতে খেতে বাড়ী যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগল। এমন কচুরি কখনও খাই নি। আমাদের গ্রামের হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি, এমন চমৎকার খেতে নয়।

উচ্ছ্বসিত সুরে বললাম—বাঃ! কিসের গন্ধ আবার!

কুসুম বললে—হিঙের কচুরি, হিঙের গন্ধ। ওকে বলে হিঙের কচুরি—এইবার বাড়ী যাও।

কুসুমের বাবু বললে—কে?

—কলের সামনে বাড়ীর ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বললেন—যাও খোকা, এইবার বাড়ী যাও।

একবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোল না। লোকটা যেন রাগী মত, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিঙের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম আমার হাতে দুখানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ী চলে যাও।

কুসুমের বাবু বলত—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনব ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও, কাল ঠিক আনব।

আমার ভয় কেটে গেল। বললাম—এনো ঠিক কাল?

কুসুমের বাবু হি হি করে হেসে বললে—আনব আনব।

কুসুম বললে—এখন বাড়ী যাও খোকা—

—আমি এখন যাব না। থাকি না কেন?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বললে, আমি তার মানে ভাল বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বলল—যাও ওকি কথা ছেলেমানুষের সঙ্গে!

বাড়ী গিয়ে মাকে বললাম—মা, তুমি হিঙের কচুরি খাও নি?

—কেন?

—আমি খেয়েছি। এত বড় বড়, হিঙের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না। ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভাল লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসে। হিঙের কচুরি রোজ দেয়।

—আবার বলে হিঙের কচুরি! বাড়ীতে পাও না কিছু? খবরদার, ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড়ী এর পরে আর দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারি নে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বললে—তুমি আস নি যে?

—মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না। মা আবার বকবে।

—আসি নি তো দুদিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা! তুমি না এলে আমারও ভাল লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করব, তেমন কপাল করি নি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবছি।

—মাকে বলব না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্দের সময় এসো।

—ঠিক আসব।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধ্যের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায় দেখে বললে—এই যে ছোকরা। ক-দিন দেখি নি কেন? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনব গো বামুন ঠাকুর, ফলারে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনব। খেয়েছ অমৃতি?

—না।

—কাল আনব, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে ব'লো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বললে, আরে ওর কথা বাদ দাও। ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে! তুমি বাড়ী যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি। খেতে খেতে যাও।

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেব না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও।

কুসুমের বাবু বললে—কেন, ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁজের সুরে বললে—তুমি থাম। বামুনের ছেলেকে হাতে করে জল দিতে পারব নি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হল কুসুমের ওপর। কেন, আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বললে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো। কেমন?

আমি কথা বললাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজনের ডাঁটা কুটছে। আমায় বললে—এস খোকা।

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা! কি করলাম আমি?

—তুমি যে বললে জল দেওয়া যায় না আমাকে। জল খেতে দিলে না কাল।

—এই? বস বস খোকা। সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারি নে। বুঝলে? কুলের আচার করছি, খাবে? এখনও হয় নি। সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেছি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তার পর আমি উঠে মাখনের ঘরে যাই। মাখন কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু, কত রকমের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখন বললে—এস খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিও না। বসো এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—অচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখন হাসিমুখে বললে—শোন কথা। তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না। বাবা খায়।

—শোন কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে? বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—হি হি—শোন কথা ছেলের, কি যে বলে! হি হি—ও কুসমি, শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখনের বয়স কুসুমের চেয়ে বেশী বলে আমার মনে হত। কুসুম সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখনকে দিদি বলে ডাকত কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারও ঘরে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেয়েদের ঘরে বাবু কখন আসত কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমার হতাশ হতে হয়েছিল। কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বললে

—অত শত কথায় তোমার দরকার কি শুনি? তুমি ছেলেমানুষ, কোন ঘরে যেতে পারবে না, বসো এখানে।

—আমি প্রভার কাছে যাব—

—কেন, সেখানে কেন? যা তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার? বোকা ছেলে। খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললাম—আমি চেয়ে খাই নি। প্রভাকে জিজ্ঞেস করো।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

—একটিবার যাব? যাব আর আসব।

সত্যি বলছি প্রভার ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখী।

টিয়া পাখীটা বলে—রাম, রাম, কে এলে? দূর ব্যাটা, কাকীমা, কাকীমা। আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে?

—আমার নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওর বুলি শুনতে। অবিকল মানুষের গলার মত কথা—কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বললে—কে ঘরের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি হাতে ছুটে এসেছে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েছে। আমি হেসে বললাম —মারবে নাকি?

—ও! পাগলা ঠাকুর। তাই বল। আমি বলি কে এল দুপুরবেলা ঘরে।

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই? কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েছে—খুব ভাল কুলচুর।

—কুসুমের বড়নোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই? কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করব।

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না? মোড়ের অত বড় দোকানখানা কুসুমের পায়ে সঁপে দিয়ে বসেছে। ওখানকার কথা ছেড়ে দ্যাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বললাম—প্রভা, রাগ ক'রো না আমার ওপর।

—না না, রাগ করব কেন। দুঃখের কথা বলছি। আমিও একপুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসি নি। পনেরো বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে। তুমি কি বুঝবে। বসো, আমার ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই?

—এস রান্নাঘরে।

প্রভার রং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকের ওপর কালো ভোমরার মত একটা আঁচিল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরে এত জিনিসপত্তর নেই, ওই খাঁচায় পোষে টিয়া-পাখীটা ছাড়া।

প্রভা রান্না করছে চালতের অম্বল। একটা পাথর বাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাই নি, দেশ থেকে এসে পর্যন্ত নয়। সেখানে আমাদের মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়।

বললাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা?

—বাজারে, আবার কোথায়?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বললে না। নিজের মনে বাঁধতে লাগল।

আমি বললাম—তোমার বাবা মা কোথায়?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি।

—বাড়ী যাবে না?

—কোন বাড়ী?

—তোমাদের দেশের বাড়ী।

—যমের বাড়ী যাব একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়ীতে কুল আছে? আমাদের গাঁয়ে কত কুলের গাছ!

প্রভা এ কথার কোন উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগল। খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগল। আমায় একবার বললেও না আমি চা খাব কি না। অবিশ্যি আমি চা খাই নে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চায়ের মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগল ওদের দেশের বাড়ীতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেত, ওদের বাড়ীর ধারে ওদের নিজেদের পুকুর কত মাছ ছিল। আর সে সব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল। বললে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—খাব। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বললে—কুসুমের অত ভয় কিসের? টের পায় তো কি হবে? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল—ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে? ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেছে পরের ছেলে।

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিছু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেল। বললে—ওকি? কোণে দাঁড়িয়ে কেন? লুকনো হল বুঝি? এ ভাত মেখেছে কে অম্বল দিয়ে? অ্যাঁ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ, পাগল। তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল? কি বলে তুমি ওকে ভাত দিয়েছ খেতে?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বললে—কেবল চালতে চালতে করছিল, তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত—

—না, ছিঃ! চল আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াব বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে? চল—হাতে এঁটো নাকি? খেয়েছ বুঝি?

আমি সলজ্জ সুরে বললাম—না।

—চল হাত ধুইয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বললে—আহা, মুখের ভাত কটা খেতে দিলি নি ওকে। সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চল।

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমার হাত ধুইয়ে দিতে দিতে বললে—তোমার অত খাই-খাই বাই কেন খোকা? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার? ছিঃ ছিঃ! ওবেলা কচুরি দেব এখন খেতে। আর ককখনো অমন খেও না। তাও বলি, এই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি, তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ, লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায় নি, সে এদিকেও ছিল না।

বললাম—মাকে যেন বলে দিও না!

—হ্যাঁ আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

—বললে মা মারবে কিন্তু।

—মার খাওয়াই ভাল তোমার! তোমার নোলা জব্দ হয় তাহলে।

বাড়ী ফিরতেই মা বললেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাস নি তো?

—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা ছিল কুসুমেরই। সে আমাকে বললে—চল খোকা, বেড়াতে যাই। যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বললাম—মা বড় রাস্তা পার হতে দেয় না। বারণ করেছে।

—চল আমি সঙ্গে আছি, ভয় নেই।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়ীতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বললে—আয় লো কুসমি কতকাল পরে—বাব্বা, আমাদেরও কি আর নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বললে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো।

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটা।

—বাঃ—বসো খোকা, বসো।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই-খাই। খেতে দ্যাও খুব খুশী।

—তাই তো, কি খেতে দিই। ঘরে কুলের আচার আছে, দেব?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই বলে উঠলাম—কুলের আচার বড্ড ভালবাসি।

কুসুম মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—তুমি কী না ভালবাস। খাবার জিনিস হলেই হল। না ভাই, ওর সর্দিকাসি হয়েছে। ও ওসব খাবে না। থাক।

আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হল। কুসুম খেতে দিলে না কুলচুর। কখন হল আমার সর্দিকাসি? কুলচুর আমি কত ভালবাসি।

খানিকটা সে-বাড়ীতে বসবার পরে আমরা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তারাও আমাকে দেখে নানা কথা জিজ্যেস করতে লাগল। বাড়ীর তৈরী সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমার নাকি পেটের অসুখ।

সন্ধ্যের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পার হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বললাম—কুসুম, দাঁড়াও—ট্রাম দেখব।

—সন্দে হয়েছে। তোমার মা বকবে।

—বকুক।

—ইস! ছেলের যে ভারি বিদ্ধি!

—আচ্ছা কুসুম, তুমি ওকথা বললে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝ। কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেব। যার তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হল! তোমার কি। কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জান?

—আচ্ছা কুসুম, 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে এ কথা?

—ওই যে ওরা তোমায় বলছিল?

—বলুক। ও সব কথায় তোমার দরকার কি। পাজী ছেলে কোথাকার!

কুসুম আমায় বাড়ীর পথে এগিয়ে দেবার আগে বললে—চল, কচুরি এতক্ষণ এনেছে ও। তোমায় দিই।

—দাও। আমার খিদে পেয়েছে।

—কোন সময়ে তোমার খিদে থাকে না বলতে পার? তোমার মাকে যদি সামনাসামনি পাই তো জিগ্যেস করি, ছেলের অত নোলা কেন।

—নোলা আছে তো বেশ হয়েছে। কচুরি দেবে তো?

—চল।

—গজা এনেছে?

—তা আমি জানি নে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবা রে বাবাঃ!

—গজা দেবে তো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বললাম। কুসুমের বাড়ী গিয়েছিলাম, কুসুম কচুরি খেতে দিয়েছে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বললেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে, তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর এল। চার-পাঁচ দিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানলার ধারেই আমাদের তক্তপোশ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উল্টো দিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মাখন। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরও দুখানা বাড়ীর পরে একখানা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

কুসুম পেছনে ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখনকে ডেকে বললে—দিদি, এই বাড়ী—এই যে—

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখন এসে জানলার ধারে দাঁড়াল।

কুসুম বললে—কি হয়েছে তোমার? যাও না কেন?

মাখন বললে—কুসমি ভেবে মরছে। বলে, বামুন খোকার কি হল। আমি তাই বললাম, চল দেখে আসি।

বললাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বললে—তোমার মা কোথায়?

—কুসুম, তুমি চলে যাও। মা দেখতে পেলে আমায় আর তোমাদের ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাব। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। নিচু সুরে বললে —যাব?

মা ঘরে নেই। বদ্যিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েছে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস তো যেন বেড়ালে খায় না, আমি বদ্যিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি।

হাত দেখিয়ে বললাম—এস।

ও জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ?

—ভাল। কাল ভাত খাব।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম। দেব?

—দাও তাড়াতাড়ি।

—খেও।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেও—

—যাব।

—কাল ভাত খাবে?

—বাবা বলেছে কাল ভাত খাব।

—কাল আবার আসব। কেমন তো?

—এসো। আমি না বললে জানলার কাছে এসো না।

—তাই করব। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। শিস দিতে পার?

—উঁহু! আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দুদিন কুসুম ঠিক আসত বিকেলবেলা। একদিন প্রভা দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও দুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলব না। বালিশের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম, মা ঘরে না থাকলে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে দুদিন কুসুমের বাড়ী গিয়েছিলাম।

তার পরেই এক ব্যাপার ঘটল। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম আমাদের দেশের বাড়ীতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাঁচ ফুটিয়ে ফেললে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল! বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে। কিন্তু মায়ের হাত সারল না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠল। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগল। আমার মামার বাড়ীর অবস্থা ভাল। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামার বাড়ীতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল দু-একটা পাকতে শুরু হয়েছে। মামার বাড়ীর গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। আমি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা

তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামার বাড়ী এসে। ভাদ্রমাসের শেষে আমরা দেশের বাড়ীতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আপিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বললে—কাল ভাই সন্ধ্যের পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে—দুধারে মুখে রং—হরিবল!

—আমিও দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে—তোমার!

—হ্যাঁ ভাই, আমার। মাইরি বলছি।

—যাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেব।

বছর পনেরো আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখনের বাড়ী যাই। কুসুম, প্রভা —কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখনই একমাত্র সে খোলার বাড়ীতে ছিল তখনও।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখন এখনও সেই বাড়ীতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, যকখি বুড়ির মত চেহারা। একটি দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখন বললে—এস এস! ভাল আছ?

—চিনতে পার?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারব না! আমাদের চোখের সামনে মানুষ হলে। ভাল কথা, কুসুমের খোঁজ পেইছি।

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার স্ট্রীটে একটা মেস-বাড়ীতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ-হাতি। মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতলা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীলের পূজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ী খুঁজে বার করলাম। সন্ধ্যে তখনও হয় নি, নীচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বললাম—তোমাদের ঝি কোথায় গেল?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি-শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বললে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজছেন।

আমি ঝিএর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখনের মত অত বুড়ি না হলেও—কুসুমও বুড়ি। বুড়ি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—আমায় খুঁজছেন আপনারা? কোত্থেকে আসছেন?

—মাখনের কাছ থেকে।

—কোন মাখন?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখন বাড়ীউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন?

—চল ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবার ঘরে বসবেন।

খাবার ঘরে গিয়ে বললাম—কুসুম, আমায় চিনতে পার?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমরা বাবা-মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ীর ভাড়াটে। মনে হয়?

কুসুম হেসে বললে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর? কত বড় হয়ে গিয়েছ। বাবা মা আছেন?

—কেউ নেই!

—ছেলেপুলে কটি?

—চার পাঁচটি।

—বসো বসো, বাবা।

আরও অনেক কথাবার্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হল। বড় বড় হিঙের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিঙের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানি নে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধুসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যোবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।

বে-নিয়ম

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খুব বিপদে প'ড়েই প্রতুলকে খবর দিলেন। রাম চাটুয্যে পাথুরে লোক ছিল সবাই জানে। প্রতুলের যখন আঠারো উনিশ বছর বয়েস তখন এ সংসারে সে এসেছিলো রাম চাটুয্যের বাসের কণ্ডাক্টর হিসেবে। দু'বছর পরে কি কারণে তার জবাব হয়ে যায়। সে আজ পাঁচ-ছ'বছর আগের কথা।

আজ তিন বছর রাম চাটুয্যে নিমোনিয়া রোগে মারা গিয়েছেন। দু'খানা বাস চলছিলো চাকদা থেকে রাণাঘাট হয়ে শান্তিপুর। মাসে হাজার খানেক টাকা আয় ছিলো দু'খানা বাসে। রাম চাটুয্যের মৃত্যুর পর তা এসে দাঁড়ালো দু'শো টাকায়। একখানা বাসের এঞ্জিনে নাকি কি গোলমাল হয়েছে—হাজার টাকার দরকার তা সারাতে। বর্তমানে দু'খানা বাসই বন্ধ।

সময় পেয়ে নানা আত্মীয়বন্ধু এসে জুটেছে। তারা সবাই হিতাকাঙ্ক্ষী। নানারকম সৎ-পরামর্শের চাপে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর রাত্রে ঘুম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। প্রত্যেকে কিছু না কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। ইতিমধ্যে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, হাতের টাকাও অর্ধেকের ওপর গিয়েছে। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্যে একমাসের কড়ারে টাকা নিয়ে বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে। কেউ ব্যবসার জন্যে টাকা নিয়ে আজও গিয়েছে কালও গিয়েছে, আর দু'টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা যে কতো গিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। ওবেলা দিয়ে যাবো, কাল বিকেলে দিয়ে যাবো ভাই—এই ধরণের সব কড়ার। আপনা-আপনির মধ্যে, না দিয়েও পারা যায় না। রাম চাটুয্যের স্ত্রী এমন অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন, খুব আত্মীয়-স্বজনের মিষ্টি কথাও আর বিশ্বাস করেন না। তাঁর জ্যাঠতুতো বোনের স্বামী একদিন এসে ধরে পড়লো—দিদি, নশো টাকা না দিলে নয়। হুণ্ডির ওয়াদা মেটাতে হবে কাল সকালে। বুধবার নিজে এসে কিংবা হরিমতীকে আর বৃন্দাবনকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাবো বলো? এমন গঙ্গাজলে ধোয়া মন আর কার আছে?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ভগ্নীপতির দেখা আর কোনদিন পান নি তারপরে। অবিশ্যি টাকাও পান নি।

সেদিন রাম চাটুয্যের নাবালক পুত্র হারাধন এসে মাকে বললে—মা, হাটে বেগুন সস্তা হয়েছে, কাল শুনেছি। আজ থেকে আর বেগুনের বাজরা বাসে যাবে না।

—কেন?

—হরিপদ প্রত্যেক বাজরা পিছু চার আনা করে জলপানি নেয়, ওরা আমাদের বাসে না গিয়ে লাহিড়ী কোম্পানীর বাসে যাচ্ছে।

—তুই হরিপদকে বললি কিছু।

—আমার কথা শোনে না। তুমি ডেকে বরং বলো।

এই হরিপদই এক হাজার টাকা চেয়ে রেখেছে বাসের এঞ্জিন সারাবার দোহাই দিয়ে। রাম চাটুয্যের স্ত্রী অনেক ভেবে দেখলেন। বাসের ব্যবসা যদি চালাতে হয়, তবে এ সব লোক দিয়ে হবে না। হরিপদ সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কানে গিয়েছে। পুলিশকে দিতে হবে বলে দু'দু'বার সে মোটা টাকা নিয়েছে, কিন্তু পুলিশকে দেয় নি। যদিও দিয়ে থাকে খুব কম, নিজে মেরে দিয়েছে টাকাটা। বিশেষ করে আজকাল যেন হরিপদ কি রকম হয়েছে। কেবলই আজ পাঁচ টাকা লাগবে, কাল আশি টাকা লাগবে, বাসের ভাড়ার টাকা ঠিকমতো আদায় দেয় না।—হিসাব চাইলেই চটে যায়। অর্থাৎ ব্যাপার এই, ও বুঝেছে ওকে ছাড়া আর চলবে না, বাসের কাজ আর কেউ জানে না, রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে যদি বাসের ব্যবসা বজায় রাখতে হয়, তবে হরিপদ ভিন্ন কাজ চলবে না। কাজেই হরিপদর মেজাজ চড়বারই কথা।

হরিপদকে ডেকে বেগুনের বাজরার জলপানির কথা বলতেই সে চটে গেল। দু'এক কথার শেষে সে বললে—অনেক কিছু ঝুঁকি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে লাইন বজায় রেখেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অলক্ষ্মীতে ধরেছে বুঝতে পেরেছি। এ লাইন যাতে পাল কোম্পানী কিংবা লাহিড়ী কোম্পানী পায়, সে চেষ্টা আমি করবো। দেখি আপনাদের কতো ইয়ে হয়েছে।

হরিপদ চ'টে বেরিয়ে গেল। সেই থেকে বাস বন্ধ। সেই থেকে নগদ টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই থেকে সংসারের অবনতির সূত্রপাত। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কতদিন থাকে?

দুপুরবেলা বারাসাত থেকে প্রতুল এলো। রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে প্রণাম ক'রে বললে—খুড়ীমা ভালো আছেন? হারাধন ভালো আছে?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললেন—এসো, এসো বাবা। ভালো আছো? বেঁচে থাকো বাবা।

—বাসের কাজ কেমন চলছে?

—সে সব অনেক কথা। বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হরিপদ রাগ করে চলে গিয়েছে। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এই জন্যেই। খাওয়া-দাওয়া করো, সব কথা বলছি।

প্রতুলকে ভাত দিলেন টক ডাল ও কাঁচকলা ভাজা দিয়ে। অসময়ে আর কিছু ছিল না ঘরে। খেয়ে দেয়ে উঠে প্রতুল বিশ্রাম করলে। তারপর উত্তরের বারান্দায় বসে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর মুখে হরিপদর কীত্তিকলাপ সব শুনলে।

হারাধন এসে বললে—প্রতুলদা, আমাদের এখানে থাকবে তো?

—তাই তো ভাবছি।

—তোমাকে ছাড়ছি নে।

—বেশ, কাকীমা বললে কি না থেকে পারি?

—মা সেজন্যেই তো তোমায় আনলে। তুমি ছাড়া আর চলবে না। হরিপদ তো আমার কথা একেবারেই শোনে না, মার কথাও শোনে না, যা ইচ্ছে তাই করতো আজকাল। আমাকে বললে দশটা টাকা দাও, চামড়ার ব্যাগটা সারাতে হবে। দিলাম। এখন দেখি যেমন ব্যাগ তেমনি আছে, গেল

টাকাটা। জানকি মুচি বললে, কই আমার কাছে তো কেউ ব্যাগ সারাতে যায় নি। আমি দশ টাকা সারাবার জন্যে নেবো, তা বলিও নি।

প্রতুল বললে—ঠিক ঠিক। দাঁড়াও, দেখি। কাকীমার মুখে সব শুনি, কি বলেন। আমার পোষাবে তবে তো থাকবো? বারাসতে আমি ব'সে ব'সে শুধু টাইম-কীপারী করি, আট ঘণ্টা কাজ, মধ্যে এক ঘণ্টা টিফিন, পঞ্চাশ টাকা মাইনে! তোমার মা কী দেবেন আগে বুঝি।

বোঝাবুঝি সেদিনই হয়ে গেল। প্রতুল কাজে লাগলো পরের দিন থেকে। হারাধন নির্বিঘ্নে স্কুলে পড়তে লাগলো! ওর মায়ের মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ সামান্য কিছু কমলেও একেবার কমলো না, স্বামীর মৃত্যুর পর জগৎটাকে তিনি যে চোখে দেখতে পেয়েছেন তাতে কমবার কথাও নয়।

প্রতুল গ্যারেজ থেকে বাস বার করতে গিয়েছে সকালে, পাশের পানের দোকানী বলরাম বললে, কি, প্রতুলবাবু যে! এলে কবে?

—এই যে—ভালো? কাল এসেছি।

—বাস বেরুবে নাকি? হরিপদর জায়গায় তুমি বুঝি এলে?

—হ্যাঁ। হরিপদও আসবে। সে এ লাইনে সাত আট বছর কাজ করেছে, সে না এলে চলে?

দিন তিনেকের মধ্যে বাজারের রামদুলাল স্বর্ণকার, বোস কোম্পানী ঘড়িওয়ালা, টুনু চক্কত্তি চায়ের দোকানী, কপিল আলুওয়ালা—মানে বাজারের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেখে অবাক হয়ে গেল রাম চাটুয্যের বাস সার্ভিস আবার চালু হয়েছে এতদিন পরে, বেশ দু'পয়সা আসছেও নিশ্চয়।

প্রতুলের চিঠি পেয়ে হরিপদ এলো। বললে—আমার তো কোনো অনিচ্ছা নেই, তবে হারাধনের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আমি শুনতে রাজী নই। আমি চাটুয্যে-মহাশয়ের পুরনো লোক, আমার সঙ্গে সেই রকম কথা বলো, আমি সব করতে রাজী। তা বলে—

প্রতুল বললে—হরিপদদা, হারাধন ছেলেমানুষ। তুমি আমি যা করবো তাই হবে। কথায় চটতে আছে—ছিঃ!

দিন সাতেকের পরে একদিন ক্যাশ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে হরিপদ বললে একটু নীচু সুরে—সাতানব্বই টাকা তেরো আনা ক্যাশ। আমার কতো, তোমার কতো?

—মানে?

হরিপদ চোখ টিপে বললে—মানে তুমিও জানো, আমিও জানি। তুমি কি আর এখানে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে খাটতে এসেছ, না আমি খাটতে এসেছি। যা হবে সে তো তুমিও—

—না দাদা, নাবালকের সম্পত্তি। আমি এসেছি ওরা ডেকেছে বলে! ওদের জিনিস বজায় রাখতে হবে, তবে তোমারও দু'পয়সা।

—সে পয়সাটা আসছে কোথা থেকে?

—কমিশন থেকে। আমি গিন্নিমার সঙ্গে কথা বলবো এ নিয়ে। আগে সাত পার্সেন্ট পাওয়া যেতো কর্তার আমলে। এখন তুমি যা বলো।

—আরে তুমি ও বুঝলে না। নিজের হাতে কলমকাটি, আবার পরের খোশামোদ করতে যাবে কেন? কমিশন টমিশন, পার্সেন্টেজ ফার্সেন্টেজের কে ধার ধারছে? যা করবো তুমি আর আমি। গিন্নিমা আবার এর মধ্যে কোথা থেকে?

হরিপদর এ অদ্বৈতবাদ প্রতুল বুঝতে পারলে না। কি জানি কেন গিন্নিমার অসহায় কান্না ওর অন্তর স্পর্শ করেছিল। নইলে সে বোকা নয়, দুজনে মিলে লুটেপুটে খেলে যে কমিশনের চেয়ে বেশি পয়সা হয় তা সে জানে। প্রতুল ক্রমে ক্রমে হরিপদর মনের ভাব বদলে দেবার চেষ্টা করলে। কিছু টাকা রোজ দিতে লাগলো রাম চাটুয্যের স্ত্রীর হাতে। অনেকদিন টাকার মুখ দেখতে পান নি তিনি।

একদিন প্রতুল বললে হরিপদকে—আচ্ছা, দাদা, চাকদা-বনগাঁ রুট তোমার কেমন মনে হয়?

—নতুন রুট। কেউ তো এ পর্যন্ত চালায় নি। প্যাসেঞ্জার হবে কি-না হবে—

—করে দেখতে দোষ কি? লাগিয়ে দিই দরখাস্ত, কি বলো? ও রুটে কমপিটিশন নেই। যে আগে অ্যাপ্লাই করবে তারই হবে।

—দেখতে পারো।

—তুমি অনেক অভিজ্ঞ আমার চেয়ে এ কাজে। তুমি কি বলো?

—নতুন দু'খানা বাস কিনতে হবে, টাকা পাবো কোথায়? কমসে কম চল্লিশ হাজার লাগবে।

—ডিসপোজালের চ্যাসিস কিনে এঞ্জিন কিনে বডি তৈরী করে নিলে সস্তায় পড়বে। ভালো আমেরিকান লরীর ফ্রেম যদি কিনি—তুমি কি বলো?

—মন্দ না। এঞ্জিন দেখেশুনে কিনতে হবে। এ রুটে বড় কমপিটিশন। বাইশ-চব্বিশখানা বাস চলচে, ভাবো? এ ঠেঙিয়ে বিশেষ উন্নতির কোনো আশা দেখছিনে।

—আচ্ছা বারাকপুর-কাঁচরাপাড়া রুট?

—বহু টাকার খেলা। দু'খানা বাসে হবে না। আবার তেমনি কমপিটিশন। তুমি বরং চাকদা রুটের জন্যে চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—হয় যদি, তবে তোমাকে নতুন রুটে যেতে হবে হরিপদদা। ওটাকে গড়ে তুলতে হলে তুমি ভিন্ন আর কেউ পারবে না। বাঁধা আসরে তো সবাই গাইতে পারে!

প্রতুলকে খুব পরিশ্রম করতে হল নতুন পথের সন্ধানে। ধানবাদে গিয়ে ওরা ডিসপোজাল থেকে আশানুরূপ জিনিস খুঁজে পেলে। নারকেলডাঙ্গার বসাক মোটর ওয়ার্কস থেকে বডি তৈরি করিয়ে নিয়ে এলো। রুটের লাইসেন্সের জন্যে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি, কারণ ও রুটে কোনো খদ্দের উপস্থিত ছিল না আদৌ। আপত্তি একটুখানি উঠেছিল কাজিপাড়ার ওসমান গনি মিঞার দিক থেকে। ওরা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার, ওদের কোন জামাই নাকি বছর দুই পূর্বে লীগ মন্ত্রিত্বের সময় রুটের একটা লাইসেন্স পেয়েছিল, কিন্তু বাস চালায় নি, কারণ তখন পেট্রল এবং অন্যান্য মোটরের উপকরণ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রতুল নিজে বড় তরফের জমিদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব মিটিয়ে

ফেলল। ঠিক হল, ভবিষ্যতে যদি কখনো ওদের জামাই বাস চালানোর ব্যবসায়ে নামে, তবে এরা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী গহনা বন্ধক রেখে কিছু টাকা যোগাড় করলেন, শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ী বাঁধা পড়লো কুণ্ডুদের কাছে। পাশের বাড়ীর অনেকে এসে নানা রকম কথা বলতে লাগলো। এ ভাবে একেবারে সর্বস্বান্ত হওয়া কি উচিত হল পরের কথা শুনে? হলই বা বিশ্বাসী পুরনো লোক।

কানাই দত্ত রাম চাটুয্যের পুরনো বন্ধু। তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত দোকানদার ও প্রবীণ ব্যক্তি। সেদিন এসে বললেন—ও বৌদিদি, শুনলাম নাকি প্রতুল ছোঁড়াটার হাতে অনেক টাকা তুলে দিচ্ছো? ব্যাপারটা কি?

—এসো বোসো ঠাকুরপো। তোমরা তো আর দেখলে না। ওই ছোঁড়াটা দেখতে এসেছে বলেই আজ না-হয় তোমরা সৎ-পরামর্শ দিতে এসেছো।

—একশোবার গালাগাল দেও, মারো বৌদিদি। ঠিক কথা। তবে আমার কথা যদি বলো, হাঁপানিতে আমার হাড়সার করেছে বৌদিদি। বড় ছেলেটা দোকান দেখাশুনো করে। গোবরা, ছোটটা, মাল গস্ত করে বড়বাজারে। আসবার দেখবার ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠিনে।

—কি বলছিলে?

—বলছিলাম, দেনা মহাজন মর্টগেজ—এ সব কি শুনছি? রাম দাদার আমলে কখনো এ কেউ শোনে নি। কেন পরের হাতে নাচছো? দেনা করে কেউ কখনো ব্যবসা করে, তাও পরের হাতে?...হারাধনকে নিয়ে পথে পথে বেড়াতে হবে শেষে। আমরা ঘুঘু ব্যবসাদার, আমার কথা শোনো।

সন্ধ্যাবেলা প্রতুল এসে বললে—টাকার কদ্দূর খুড়ীমা?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললেন—টাকার যোগাড় তো হয়েছে। কিন্তু সকলে যে বড় ভয় দেখাচ্ছে প্রতুল!

—কোনো ভয় নেই খুড়ীমা আপনি টাকা দিয়ে দিন আমার হাতে। দেখুন দুটো মাসে আমি কি করি।

—বেশ দ্যাখো। আমি কারো কথা শুনলাম না। তুমি যা হয় কোরো। তবে তুমি কিছু মনে কোনো না, আমার ছেলে এ কাজ করতে গেলেও তাকে আমি ঠিক এমনি কথাই বলতাম। যাও, মা মনসার পূজো দেবো ভবানীচকের বাজারে। মুখ তুলে চান যদি।

—একটা ভালো দিন দেখে সত্যনারায়ণের পূজো দিন খুড়ীমা। সেদিন থেকে কাজ আরম্ভ করবো। দত্ত বুড়োকে নেমন্তন্ন করবেন।

সত্যনারায়ণের সিন্নিতে গ্রামসুদ্ধ লোকে রাম চাটুয্যের বাড়ী দুখানা লুচি, নানা রকম কাটা ফল, কাঁচা সিন্নি, সন্দেশ ও রসগোল্লা খেয়ে গেল। কেউ বললে, গিন্নীর মন খুব ভালো। কেউ বললে, পরের হাতে খেলছে, এইবার পথে বসবে আর কি।

নতুন বাসের লাইন খুললো।

প্রতুল নিজে বাসে চড়ে চাকদা থেকে বনগাঁ পর্যন্ত গেল। মুখে ভেঁপু দিয়ে একটি ছোকরা চীৎকার করতে করতে চলল—নতুন লাইন খুলেচে! চাকদা থেকে বনগাঁ! ভাড়া দশ আনা বেলের বাজার! এক টাকা বনগাঁ! দু'খানা বাস সারাদিনে যাবে! দুবেলা ছাড়বে! চাকদা থেকে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হবে! তরকারির ভেণ্ডারদের অত্যন্ত সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে—!

মাত্র সাতজন হল প্রথম দিন। সপ্তাহের শেষে উঠলো বাইশ জন।

হরিপদ বললে—অতগুলো টাকা শেষে জলাঞ্জলি না যায়। একজন ভেণ্ডারও তো হল না।

প্রতুল বললে—হরিপদদা, বেলের হাটের দিন আমরা আর বনগাঁ পর্যন্ত যাবো না। শুধু তরকারির বাজরা তুলবো—এদিকে চাকদা, এদিকে রানাঘাট।

—রাণাঘাট গেলে পুলিশ ধরবে, ও রুটের লাইসেন্স তোমার কই?

—সে তুমি ভেবো না দাদা। তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে চালিয়ে নেবো।

সত্যিই হরিপদ ঠিক বলেছিল। পুলিশ ধরলে, থানায় নিয়ে গেল, প্রতুলের কোনো কথা শুনলে না, কেস কোর্টে দেবার জন্যে তৈরি হল। ওদের দুজনকে একরাত্রি থানায় হাজতে বাস করতে হল। প্রতুল রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বললে—বড্ড মশা, হরিপদদা—

—তোমার কথা শুনে এ কি নাকাল আমার! জীবনে কখনো হাজত-বাস করি নি।

—বিনা লাইসেন্সে গাড়ী চালিয়েছি তা হাজত-বাস করতে হবে কেন? আমরা চুরি করি নি তো।

—সে তুমি বোঝো। তুমি এত জানো, এত বোঝো, তাহলে নিশ্চয় এটাও জানো।

—কাল সকালে দেখবো।

—আমাকে ওভারটাইমের মাইনে দিতে হবে হাজত-বাসের জন্যে তা বলে দিচ্ছি। তোমাদের গাড়ীতে খাটতে এসেছি বলে চোরের মত হাজত-বাস করতে আসি নি, তা বলে দিচ্ছি।

—নিও, দেবো। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই আগে। মশায় খেয়ে ফেলে দিলে!

—বুদ্ধি তোমার বড্ড সরু কিনা! একশোবার বলি নি?

পরদিন সকালে প্রতুল অনেক কৌশলে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এলো। খরচ বাদে নগদ চল্লিশ টাকা লাভ এই একদিনে।

সেই থেকে প্রতি হাটবার রাণাঘাট যাতায়াত করে প্রতুল বাস নিয়ে। পুলিশের কলকাটিতে সবদিক ঠাণ্ডা আছে। ওদের হাজত-বাস আর করতে হয় না।

আর একটা গোলমাল খুব শীগগির বাধলো। সেটা খুব মারাত্মক রকমের গোলমাল।

মাস দুই পরে যখন চল্লিশ জন গড়ে যাত্রী হচ্ছে, মালপত্রও ভালো হচ্ছে— সেই সময় একদিন হরিপদ বললে—প্রতুলদা, এ রাস্তায় বাস চলবে না। লজ ঝড় রাস্তা, টায়ার কতবার বদলাবে? এঞ্জিন খুব ভালো তাই, আমেরিকার এঞ্জিন, কিন্তু এ ধাক্কা কতদিন সইবে? বর্ষা পড়ে গিয়েছে, একবার দেখে এসো একদিন।

প্রতুল একদিন নিজের চোখে দেখতে গেল। বাবাঃ, এই রাস্তার অবস্থা! ওর চোখ কপালে উঠলো আর কি। কে জানতো বর্ষার সময়ে রাস্তা এমন হবে? এখানে গর্ত, ওখানে এঁকেবেঁকে চালাতে গিয়ে

একদিন হরিপদ এক গাছের গায়ে গাড়িসুদ্ধু মারলে তাল। বনেট বেঁকে দুমড়ে গেল। কারবুরেটরের ভীষণ ক্ষতি হল। হরিপদর বাঁ হাতখানা জখম হল।

আরও মুশকিল। বোঝাই গাড়ী, সেদিন ছিল বেলের হাট, পটল ও বেগুনের বাজরা ছিল কুড়িটা। গরুর গাড়ীতে রানাঘাট নিয়ে যাওয়ার খরচ বাইশ টাকা দিতে হল, টিকিট সব ফেরৎ দিতে হল, হরিপদকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। সবসুদ্ধ একশো ন' টাকা লোকসান এদিকে, বনেট ও কারবুরেটরের প্রশ্ন বাদ দিয়ে। দুশো আড়াইশো টাকা সবসুদ্ধ।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী সব শুনে বললেন—আমার সময় খারাপ পড়েছে। তোমাদের কোনো দোষ নেই প্রতুল। নইলে হরিপদই বা গাছের গায়ে তাল মারতে যাবে কেন? সে তো পুরনো ড্রাইভার। রাস্তা খারাপ, আগে দেখনি কেন?

—তখন এমন ছিল না সত্যি বলছি খুড়ীমা। বর্ষার আগে বুঝতেই পারিনি।

—কি করবে এখন? ও রাস্তায় আর গাড়ী চালিও না। গাড়ী দু'খানা ভাঙলে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হবে।

—লাইসেন্স নেওয়া রুট বন্ধ করা ঠিক হবে খুড়ীমা? বেশ প্যাসেঞ্জার হ'তে শুরু হয়েছে। এখন যদি ছেড়ে দিই—

—কি করবে তবে?

—আমাকে আরো দু'হাজার টাকা দিতে হবে খুড়ীমা।

—সে কি কথা বাবা?

—হ্যাঁ, আমাকে দিতেই হবে। আমার মতলব শুনুন। ও রাস্তা আমি মোটর কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৈরী করে নেবো। দু'হাজার আমরা দেবো, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড আর রোড বোর্ড থেকে কিছু বার করবো। বাস ও রাস্তাতে চালাবোই।

—তা তো বুঝলাম, টাকা দেবো কোথা থেকে?

—তাও আমি ভেবেছি। অন্য লাইনের বাস মার্টগেজ রাখতে হবে। তাহলে টাকা সবাই দেবে। নয় তো রুট সার্ভিস মর্টগেজ করা যেতে পারে—যতদিন দেনা শোধ না হয়, তাদের নিজের লোক থাকবে আমাদের গাড়ীতে ব'সে। ক্যাশ নেবে নিজের হাতে। তারও লোক আছে—আপনার হুকুম পেলেই আনি।

—যা ভালো বোঝো করো বাবা, তবে দেখো, হারাধন তোমার ছোট ভাই, সে যেন পথে না বসে।

এত সহজ কিন্তু কাজ মেটে নি।

এই কথা কি ভাবে গাঁয়ের মধ্যে প্রচার হবার সঙ্গে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর কাছে বড় বড় বাড়ী থেকে মেয়ে, গিন্নি, কর্তারা উপদেশ দিতে আসতে যেতে লাগলেন। কানাই দত্ত বললে— চোখের ওপর এ কি সর্বনাশ করছো বৌদিদি? ছেলেটা তো পথে বসেছে, আর বাকি কি আছে? আমার কথা শোনো, ও ছোঁড়াটাকে দাও হাঁকিয়ে বিদায় করে। তুমি না পারো আমি দিচ্ছি।

অনেক কিছু ব্যাপার হয়ে গেল। অনেক কথা কাটাকাটি, এমন কি ঝগড়া পর্যন্ত। তবুও প্রতুল দমল না। হারাধনকে ডেকে বললে, তোমার মাকে বোঝাও হারাধন। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি বুঝবে। মেয়েছেলেকে বোঝানো এক মস্ত দায়, রাস্তা বানাতেই হবে আমাদের।

মাসখানেক চাকদা-বনগাঁ সার্ভিস একদম বন্ধ রইল এই সব নানা গোলমালে। শেষ পর্যন্ত প্রতুল জিতে গেল। দু' হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিলেন রাম চাটুয্যের স্ত্রী। চোখের জল দু ফোঁটা পড়লো টাকা দেবার সময়।

প্রতুল রোড বোর্ডের দু একজন হোমরা-চোমরার কাছে চিঠি নিয়ে তাঁদের ধরলে। তাঁরা বললেন —ও রাস্তা মার্চ থেকে পি ডব্লিউ ডি-র হাতে যাবে। তারাই দেবে। আমাদের কি স্বার্থ আছে ওতে? জেলা বোর্ডও সেই উত্তর দিলে। নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে খুব বেশি ক'রে ধরতে তিনি বললেন—তুমি একলা মুভ করলে কিছু হবে না। ঐ অঞ্চলের স্কুলের ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং সাধারণ অধিবাসীদের সইওয়ালা এক দরখাস্ত দাও বোর্ডে। দেখি কি করতে পারি।

অনেক জল বেড়াবেড়ির পরে মাস-খানেক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে নদীয়া জেলা বোর্ড তাদের সীমানার মধ্যের রাস্তাটুকু মেরামত করে দিতে রাজী হল। তাও ঠিক হল, নারানপুর ও আকাইপুর হাই স্কুলের ছেলেদের অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত করতে দিতে হবে। চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ড কিছুতেই রাজী হল না, অত বড় জায়গায় গিয়ে ধরাধরি করতে পারলেও না প্রতুল। রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললে—লাইন তো বন্ধ রাখলে, রাস্তার কতদূর হল?

—যেখানে খুব খারাপ, সেখানে হয়ে গিয়েছে। চব্বিশ পরগণা না ক'রে দিলেও চলে যাবে একরকম। কিন্তু একটা কথা—

—কি?

প্রতুল মাথা চুলকে বললে—আর পাঁচশো টাকা দিতে হবে। আপনার পায়ে পড়ি খুড়িমা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। টাকার দরকার হয়েছে কেন, বলি শুনুন। বেলের হাটের সামনে ব্যাপারীদের জিনিস রাখবার জন্যে একটা টিনের চালা তৈরী না ক'রে দিলে ওদের বড় অসুবিধে হচ্ছে। যদি আমাদের তৈরী টিনের চালাতে বসে, তবে আমাদের গাড়ীতেই যেতে হবে। তরকারির বাজরাতেই তো পয়সা। এ-বাদে একটা সাঁকো সারাতে হবে। তাতেও শ'খানেক টাকা খরচ হবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খয়ে-বন্ধনে পড়েছেন বিবেচনা করলেন।

এ টাকা না দিলেও চলবে না, আগের টাকাগুলো জলাঞ্জলি যায় তাহলে। দিতেই হবে। এ কি মুশকিলের কথা, প্রতুল কেবলই বলে টাকা দাও। ওকে এনে কি শেষ পর্যন্ত ভুল ক'রেই বসলেন? কানাই দত্ত কি তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল?

শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে হল রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে। বড় কষ্টেই এ টাকা দিলেন তিনি। সোনাদানা ঘরে আর এক কুঁচোও রইল না।

দুমাস ধরে বহু চেষ্টার পরে লাইন খুললো। অনেকদিন ধ'রে বিজ্ঞাপনের ফলে লোক জানাজানি হয়েছিল বেশ, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর ভিড় হ'তে লাগলো। হাটের চালা ক'রে দেওয়ার ফলে তরকারির

ব্যাপারীদের এই বর্ষাকালে খুব সুবিধে হয়েছে। তারা সবাই বাসের খদ্দের হয়ে উঠলো।

সকাল বেলা। রাম চাটুয্যের স্ত্রী স্নান করে উঠে আহ্নিকে বসবেন এমন সময়ে প্রতুল এসে দাঁড়ালো সামনে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রীর বুক কেঁপে উঠলো। আবার বুঝি টাকা চায়!

প্রতুল পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার করে ওঁর পায়ের কাছে রেখে বললে—এই নিন। কাল প্রথম দিন লাইন খুলেছি। দিনের ক্যাশ।

—এক দিনের?

—আরও বাড়বে। সামনের মাস থেকে বোধ হয় দেড়শো টাকা করে দিতে পারবো। হাটের ব্যাপারীদের খুব ভিড় হচ্ছে। সামনের বছরে একখানা বাস কিনতে হবে টাকা দেবেন—তাহলে দিন দু'শো টাকা বাঁধা রইলো। হারাধনকে মোটর এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে দিতে হবে খুড়ীমা। আমাদের আপিসের কর্তা হ'তে হলে মোটর এঞ্জিনিয়ার হ'তে হবে।

আমরা এক বৎসর পরের কথা বলছি। গত চৈত্র মাসে একবার আমরা রাম চাটুয্যের নতুন কাটা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। রাম চাটুয্যের নামে তাঁর স্ত্রী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামে জলের কষ্ট ছিল খুবই। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে যে একটা নতুন বাড়ী খানিকটা উঠে বন্ধ আছে সিমেন্টের অভাবে—রাম চাটুয্যের নতুন বাড়ী সেটা, প্রতুল ও হারাধন অনেক খাটছে বাড়ীটার পেছনে।

প্রতুলকে আমি কখনো দেখি নি। ওর সমস্ত গল্পটাই আমি শুনেছি স্থানীয় লোকদের কাছে। আজকালকার এই অসাধুতার যুগে প্রতুলের কাহিনী আমার খুব ভালো লেগেছিল, অদূর ভবিষ্যতে একবার আলাপ করবার ইচ্ছে আছে ওর সঙ্গে।

ডালুর বিপদ

মস্ত বড় কাঠের নৌকাটা সারা গ্রামের বালক-বালিকাদের নিকট একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে গত কয়েকদিন হইতে। চালানি কাঠের নৌকা, বড়-বড় গুঁড়ি পড়িয়া আছে নদীর ধারে, হাতীর মত বড়-বড় গুঁড়ি! কয়েকদিন হইতেই দেখিতেছে ডালু। মা হাঁক দেয়—ও ডালু, সান্টু, মুড়ি খেয়ে যা—উহাদের দু-জনের পাত্তা নাই।

মা বলে—ওরা বসে আছে গিয়ে দ্যাখো সেই নদীর ধারে। শুধু খাবো আর গাঙের ধারে টো-টো করবো। কি বিপদেই পড়েছি এদের নিয়ে!

কিন্তু নৌকার মোহ হঠাৎ এদের পরিত্যাগ করে না। নদীর ধারে যেখানে ঝিঙের ক্ষেতে বর্ষাকালের সন্ধ্যায় ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া আছে, সেখানেই বড় নৌকাখানা বাঁধা।

দেখিয়া-দেখিয়া ডালু-সান্টুর আশ মেটে না। অতবড় নৌকা গড়ায় কি করিয়া? কারা গড়ায়? নৌকার গলুই-এর দুপাশে দুটি বড়-বড় পেতলের চোখ। তার একটু ওপরে সিঁদুর লাগানো। ডালু সান্টুকে বলে—নৌকো দেখলি?

—মস্ত বড়—আচ্ছা, ঐখানে চোখ কেন? নৌকো কি দেখতে পায়, দাদা?

—দূর বোকা! ও অমনি করে রেখেচে! সব নৌকোর কি চোখ থাকে? থাকে না।

—কি করে জানলি?

—আমি তোর চেয়ে বড় যে! তুই কবে জন্মেচিস, আর আমি কবে জন্মিচি!

সেদিন নদীর নিচু পাড়ে বসিয়া দুই ভাই হাঁ করিয়া দুই চক্ষু ভরিয়া নৌকা দেখিতেছে। নৌকার মাঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম?

—ডালু।

—উটি কেডা?

—আমার ভাই সান্টু।

—কি জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—বাড়ী কনে?

—এই গ্রামে।

—এসো, মোদের নৌকো দেখতি আসবা না?

ডালুর খুব ইচ্ছা নৌকা দেখিবার, কিন্তু মা যদি বকে! সাহস করিয়া উঠিতে পারিলে মজা হইত বটে, কিন্তু সাহস হয় না। এখন ঘাটে লোকজনের যাতায়াত, ইহাদের মধ্যে কেহ গিয়া মাকে বলিয়া

দিতে পারে। এমন সময়ে আসিতে হইবে যখন ঘাটে কেউ থাকে না। ডালু উদাসীন সুরে বলিল—চলরে সান্টু, বাড়ী যাই।

ভাইয়ের হাত ধরিয়া ডালু বাড়ী চলিয়া গেল।

পথের বাঁদিকে উঁচু ভাঙামত জায়গা তাতে বড়-বড় আম কাঁঠালের গাছ। কোনকালে এখানে ডিঙি-নৌকা আর বড় নৌকার কারখানা ছিল। অর্জুন মাঝির কারখানা। কত ধরনের ছোট নৌকা, বড় মহাজনী নৌকা এখানে তৈরি হইত আগে—ডালু কারখানা দেখে নাই, দেখিয়াছে অর্জুন মাঝিকে। মাজাভাঙা বাঁকাচোরা বুড়ো তেঁতুলতলার ঘাটে বসিয়া তামাক খায় আর মাছ ধরিবার দোয়াড়ি বোনে। কত ধরনের নৌকার গল্প ও নৌকা-ভ্রমণের গল্প করে অর্জুন বুড়ো। ওর মুখে গল্প শুনিয়া পর্যন্ত নৌকার উপর অত্যন্ত মোহ। বড় মহাজনী নৌকা দেখিলে সে যেন কেমন হইয়া যায়!

সান্টু বলিল—দাদা যাবি নে নৌকা দেখতে?

—এখন না, সবাই চলে যাক ঘাট থেকে।

—ওরা নৌকোতে উঠতে বললে—উঠলি নে?

—মা বকবে।

—আমাকে নিয়ে আসবি তো?

—তুই আর আমি দু-জনেই তো আসবো। সন্ধেবেলা।

সান্টুর ভাল লাগিল না প্রস্তাবটা। সন্দেবেলা এই নদীর ধারে আসা যায়? চিন্তে বাগদির ভিটের ঝাঁকড়া-তেঁতুল গাছটাতে হাঁড়কাটার মা থাকে, ছোট-ছোট ছেলেকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গাছের মগডালে তোলে। সময়টা বড় খারাপ। সান্টু ভয়ের কথাটা দাদাকে বলিয়াই ফেলিল।

ডালু ধমক দিয়া বলিল—তুই বড্ড বোকা!

— কেন দাদা? আর তুমি বুঝি বোকা নও?

—তোর মত না।

দিনের বাকি সময়টা কোনোরকমে কাটিল। ডালু ভাবে কখন যে সন্ধ্যা হইবে, কখন নৌকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না, ডালুর মন ছট ফট করিতে থাকে। সাণ্টু অতশত বোঝে না। দাদা যেখানে, সেও সেখানে।

ডালু দু গাছা ছিপ লইয়া সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে নদীর ধারে গেল। সঙ্গে চলিল সান্টু। বড় নৌকাখানা সেখানে বাঁধা ছিল।

কাঠের নৌকার মাঝি বলিল—খোকা, নৌকো দেখবে নাকি?

ডালুকে দুবার বলিতে হইল না! সান্টুকে লইয়া তখনি নৌকায় উঠিল।

নৌকার মধ্যে কত কি যে জিনিস! মস্ত নৌকার খোলে লোকেদের বসিবার ও শুইবার জায়গা। রান্নার জন্যে উনুন আছে, হাঁড়ি আছে। বড় একটা বিলিতি কুমড়ো দড়ির শিকেতে ঝুলানো।

মাঝিকে ডালু বলিল—তোমরা এখানে খাও?

—হ্যাঁ।

—কি রাঁধো?

—যা পাই খোকা? আমরা গরীব লোক, কিনবার ক্ষ্যামতা নেই তো!

—আচ্ছা, তোমরা কত জায়গায় গিয়েচ?

—তুমি চিনবে না সে সব জায়গা। বরিশাল জেলার নাম শুনেছ? সেই বরিশাল জেলা।

—কি আছে সেখানে?

—হাঙর আছে, কুমীর আছে, দু-মুখো সাপ আছে। কতরকমের জানোয়ার আছে। লালমুখো বানর আছে। দু-মাথাওয়ালা তালগাছ আছে।

সান্টুর চোখ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে ডাগর-ডাগর হইয়া উঠিল। এমন কথা সে কখনো শোনে নাই। লালমুখো বানর ও দু-মাথাওয়ালা তালগাছ না জানি দেখিতে কি রকম!

সে বলিল—তালগাছে হাঁড়াকাটার মা আছে?

—হ্যাঁ!

—হাঁড়াকাটার মা আছে তালগাছে?

—সে আবার কি?

—হালু বিজ্ঞের মত মুখখানা করিয়া বলিল—ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। কি বাজে কথা বলচে।

মাঝি বলিল—মস্তবড় কুমির আছে সেখানে, বুঝলে? তেমন কখনো দেখো নি।

ডালু বা সান্টু কোনোদিন একটি অতি ক্ষুদ্র গিরগিটির মত কুমিরও দেখে নাই; মস্তবড় কুমির তো দূরের কথা! দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল।

একজন বুড়ো মাঝি নৌকার গলুইতে বসিয়া বেগুন কুটিতেছিল। সে বেগুন-কোটা ফেলিয়া রাখিয়া এদিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কি শুনচো খোকা-বাবুরা? আমি নিজের চোখে যা সাপ দেখেচি সুঁদর-বনের—

ডালু ও সান্টু উভয়েই অধীর আগ্রহে বলিল—কত বড়?

—তালগাছের মত মোটা।

ডালু বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—উঃ রে! আর কত লম্বা?

—হাত ত্রিশ-চল্লিশ।

ডালু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল! এতবড় সাপ হয়, কেউ কখনো শোনে নাই। সুন্দরবনের কাণ্ডই আলাদা! সত্যই কি আশ্চর্য দেশ!

বুড়ো মাঝি গল্প করিতে লাগিল—সেবার সুন্দরবনে সুঁদরি কাঠ আনতি গিয়েছিলাম। চোরামুখোর কাছারি থেকে তিন ভাটি গেলে তবে ভাঙনডাঙার জঙ্গল, রানীতলার জঙ্গল, বড্ড ভারি জঙ্গল।

—তারপর—

এখানে বৃদ্ধ গল্প বন্ধ করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। ডালু সান্টুর আর সহ্য হয় না, তামাক খাইবার কি এই সময়?

ডালু অধীর আগ্রহের সুরে বলিল—তারপর?

—তারপর আমরা খালে নৌকো নোঙর করে ভাঙনডাঙার জঙ্গলে গিইচি মৌচাক ভাঙতি। একটা তালগাছের গুড়ির মত জিনিস এক জায়গায় পড়ে আছে। তার ওপর লতাপাতা। আমরা হেঁটে-হেঁটে গিইছিলাম। যেমন বসলাম, অমনি দেখি নড়ে উঠেচে! ও মা তারপরে দেখি সরে সরে যাচ্চে গাছের গুঁড়িটা! তখন দেখি গুঁড়ি নয়। মস্তবড় সাপ নড়চে। তখনি দেলাম ছুট। হাঁ করে নিঃশ্বেস ফেলে সেই সাপে। নিঃশ্বেস টানার জোরে ছোট-ছোট জানোয়ার এসে ওর মুখের মধ্যি ঢুকে যায়।

—তারপর কি হোল হ্যাঁগো?

—আবার কি হবে! পালালাম মোরা সোজা। আর কি সেখানে দাঁড়াই? বাঘও দেখিচি বড়-বড়—কিন্তু বাঘের চেয়েও সাপ বড্ড ভীষণ জানোয়ার, খোকাবাবুরা।

—কেন? বাঘের চেয়েও ভয়ানক?

—সাপ যে নিঃশ্বেসে টেনে নেয় কিনা? ঘাপটি মেরে থাকে জলের ধারে—ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। কেউ টের পায় না আগে থেকে, হঠাৎ টেনে নেয়। পাকে-পাকে জড়িয়ে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলে বাবু! পিণ্ডি পাকিয়ে দেয় একেবারে।

বাহিরে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। কেরোসিনের টেমিটা টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় নৌকার খোল প্রায় ভরিয়া আসিল। ডালুর গা যেন শিহরিয়া উঠিল! তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছে, এখানে এ সন্ধ্যায় না আসিলেই হইত। হঠাৎ সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

যখন ঘুম ভাঙিল, সে দেখিল নদীর ধার হইতে কিছু দূরে একটা আম-কাঠের বড় গুঁড়ির উপর শুইয়া আছে। ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এখানে সে কেমন করিয়া আসিল?

সে দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া লইল! রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে, মাথার উপর বাদুড় ঝটপট করিতেছে, তারাভরা আকাশ। সে এখানে কেন? নৌকা কোথায়? সান্টু কোথায়? ডালু ছুটিয়া গেল নদীর ধারে। ওই তো সেই বেনার ঝোপ নদীর পাড়ে। ওইখানেই ওই বেনার ঝোপের মধ্যেই তো লোহার বড় নোঙর ফেলিয়া নৌকাটি দাঁড়াইয়া ছিল! সে নৌকা তো নাই! সান্টু কোথায়? ডালু ভাইয়ের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—সান্টু—উ-উ-উ—ও-ও সান্টু—উ-উ—কেহ উত্তর দিল না নৌকাই নাই, উত্তর দিবে কোথা হইতে! ডালুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল।

নৌকাওয়ালা সান্টুকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে নামাইয়া দিয়া ভাইটিকে লইয়া পলাইয়াছে। ছোট ভাইটিকে মারিয়া ফেলিবে হয়তো! ডালু ছুটিতে ছুটিতে আসিল। ডালুর মা রান্নাঘরে কি কাজ করিতেছেন। ডালুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এসো তোমার পিঠের ছালচামড়া তুলি। বের করচি তোমার পাড়া বেড়ানো। সান্টু কই?

ডালু বলিল সব কথা। কাঁদিয়া বলিল—মা সান্টুকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। মেরে ফেলবে। সে কি ভীষণ কান্না! কান্নার বেগে ডালু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মাও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

এমন সময় পাঁজরে ঘা খাইয়া ডালুর কান্না থামিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখিল, বুড়ো মাঝিটা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিতেছে। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝিটা। ডালু বলিয়া উঠিল—সান্টু—আমার ভাই সান্টুকে কোথায় নিয়ে গিয়েচে?

—অ্যাঁ?

—চালাকি করো না! আমার ভাই সান্টু—কোথায় সে? মেরো না ওকে।

—আরে খোকাবাবু বলে কি? ঘুমের ঘোরে কি রকম গোঙাচ্চে আর বিড়বিড় করচে। এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি দেখচি!

নৌকার ও-খোল হইতে একজন মাঝি বলিয়া উঠিল—চকি জল দাও। ছেলেমানুষ স্বপন দেখেচে।

ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।—সেই নৌকা। সেই নৌকার খোল। সেই বৃদ্ধ মাঝি তাহার সামনে। ওই তো সান্টু ঘুমাইতেছে! সান্টুই তো! সে ডাকিল—এই সান্টু, ওঠ—ওঠ! দুই ভাই নৌকা হইতে নামিল। মাঝিরা বলিল—কি ঘুম রে বাবা! ছেলেমানুষ সব। যাও খোকাবাবুরা। সাবধানে বাড়ী যাও। বড্ড অন্ধকার।

পথে আসিয়া ডালু ঠাস করিয়া ছোট ভাইকে এক চড় কষাইয়া বলিল—কেবল ঘুম, কেবল ঘুম! বাঁদর কোথাকার! আবার তোমাকে কোনোদিন সঙ্গে নিয়ে আসবো, এসো আবার।—ঘুমুলি কি বলে নৌকার মধ্যে তুই?

Table of Contents

Title Page	1
Copyright Page	2
বিভূতিভূষণের ছোটগল্প	3
গল্পক্রম	12
ভণ্ডুলমামার বাড়ি	13
অরন্ধনের নিমন্ত্রণ	23
একটি দিনের কথা	40
তালনবমী	48
আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা	53
পুঁই মাচা	66
দ্রবময়ীর কাশীবাস	78
ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল	95
অসাধারণ	106
রাসু হাড়ি	113
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব	123
হিঙের কচুরি	132
বে-নিয়ম	145
ডালুর বিপদ	154